আলাপ

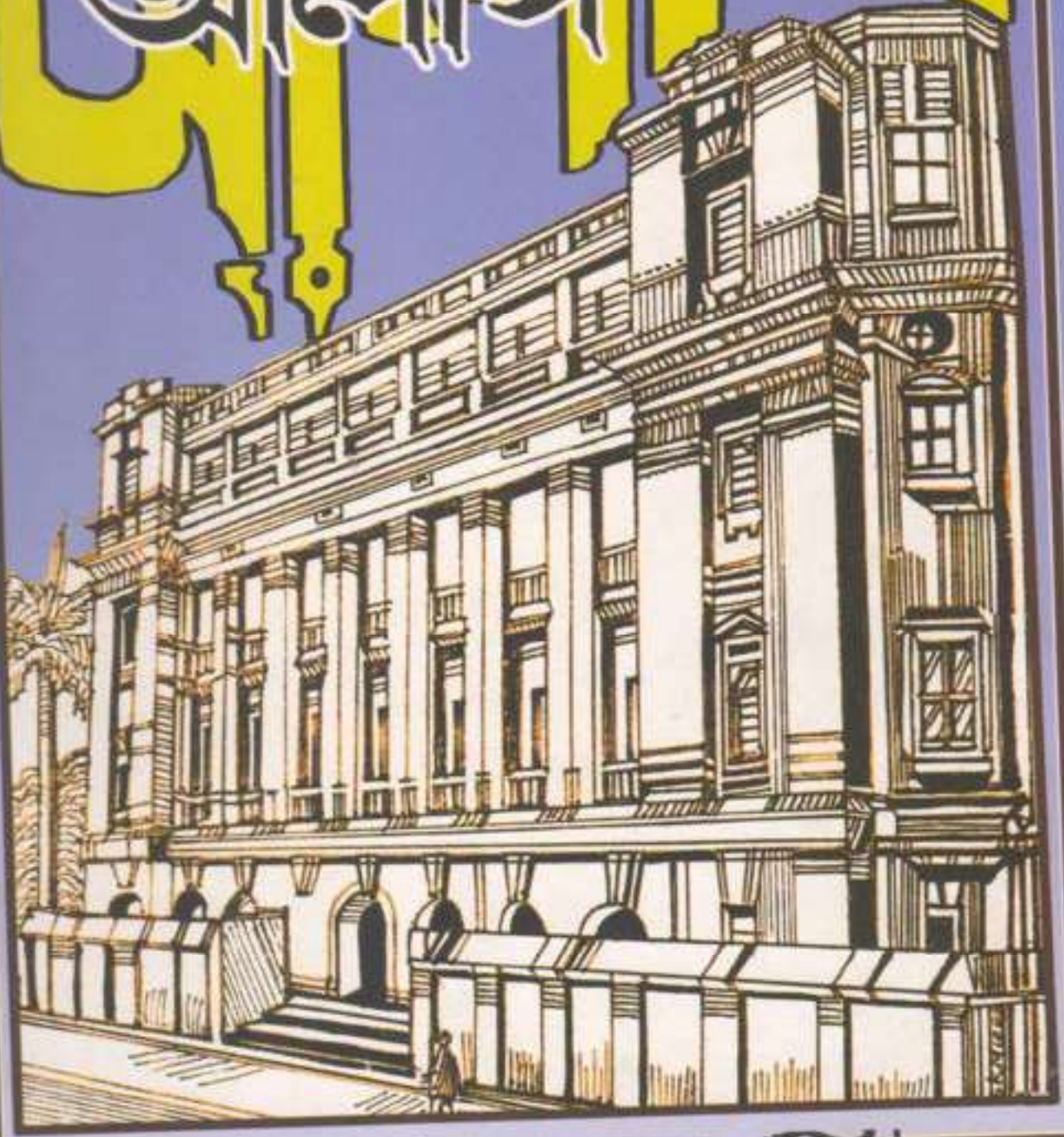

আনন্দমোহন কলেজ পত্রিকা

২০১৫ - ২০১৬

আনন্দমোহন কলেজ

সিটি কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা

শ্রী আনন্দমোহন বসু

জন্ম : ২৩/০৯/১৮৪৭ • মৃত্যু : ২০/০৮/১৯০৬

অধ্যক্ষ ড. প্রদীপ কুমার মাইতি

অধ্যক্ষের কথা

আমাদের সামাজিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক আবহ—এই সমস্ত কিছুই কিছুকালের ঘটে চলা নানা ঘটনায় ও নানা ঝড় ঝাপটায় অকেটাই পাল্টে গেছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপনে, ভাব বিনিময়ের ভাষায় এবং আচরণে এসেছে অনেক পরিবর্তন। "বিশ্বায়ন" নামক একটি শব্দ আমাদের প্রায় জব্দ করেছে। প্রভাব ফেলেছে ছাপ রেখেছে হাওয়া বদলের। তবুও তারই মধ্যে কয়েক বছরের ছেদ কাটিয়ে অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কলেজের একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা, দিনবদলের ছোঁয়ায় নতুন ভাবে "আলাপ" নামে। এই শুভক্ষণে লেখায় ও প্রকাশনায় যুক্ত সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে থাকে নিজেকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন। কামনা করি যাদের স্বপ্ন লেখায় ফুটে উঠেছে তারা ভবিষ্যৎ-এ বিচক্ষণ চিন্তাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক।

ড. প্রদীপকুমার মাইতি

সম্পাদকের কথা

আজ হিংসা, সন্ত্রাস হানাহানিতে যখন সমগ্র বিশ্ব উত্তাল, তখন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র কলেজ থেকে বেশ কয়েক বছর পরে একটি কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করা হল। ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের এই সম্মিলিত শুভ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসাই। আমরা সকলে এই পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত।

কলেজ পত্রিকায় হাত-মক্স করে ভবিষ্যতে যে কেউ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাবে না এ কথা কে বলতে পারে। তাই দরকার এই সব প্রতিভার লালন। তাই শিক্ষার্থীদের উদ্যম ও আগ্রহ, ছাত্র সংসদের অফুরন্ত উৎসাহ এবং অধ্যাপকদের অমিত সাহায্য কলেজ পত্রিকা 'আলাপ'কে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে। অধ্যাপকদের তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং ছাত্রদের বেশ ভালো কিছু গল্প, হৃদয়স্পর্শী কবিতা পত্রিকাটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে আমি আশা করব আমাদের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এখন থেকে সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে তারা যেন তাদের সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ ঘটায়। নিয়মিতভাবে দেওয়াল পত্রিকা এবং বার্ষিক পত্রিকার জন্য লেখা প্রস্তুত করো। এতে ভবিষ্যতে পত্রিকা আরও সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে উঠবে।

সমস্ত শিক্ষার্থী, পত্রিকা প্রতিনিধিদের জন্য রইল আমাদের বলিষ্ঠ অভিনন্দন। আমাদের অনেক স্বপ্ন অনেক আশা 'আলাপ'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আশা করি আমাদের এই প্রয়াস আপনাদের মন জয় করবে।

অভিলাষ অধিকারী

দ্বিতীয় বর্ষ (ইংরাজি, সাম্মানিক)

স্বর্ণমন্দির প্রসঙ্গে

বরিষ্ঠ করণিক শ্রী শ্যামলচাঁদ বড়ালের স্মৃতিচারণ ও শুভেচ্ছাবার্তা

(প্রবীণ করণিক, আনন্দমোহন কলেজ)

আমি একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে চাকুরী জীবনের শেষ বেলায় এসে কিছু কথা লিখতে বসেছি। কলকাতায় প্রাচীনতম যত কলেজ আছে তাদের মধ্যে অন্যতম সিটি গ্রুপ অব কলেজের অধীনে "আনন্দমোহন কলেজ"। এই কলেজ ১০২/১, রাজা রামমোহন সরণী কলকাতা-৯ এ অবস্থিত। আনন্দমোহন কলেজ ১৯৬১ সালে সান্ধ্য কলেজরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ এই কলেজ আমার হৃদমাঝারে "স্বর্ণমন্দির রূপে" বিরাজমান।

১৯৯০ সালে ২২শে মার্চ তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ সিংহরায় মহাশয় এবং উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মোহন চাঁদ বড়াল ও শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘড়া মহাশয়দের আশীর্বাদে কর্মীরূপে এই কলেজে যোগদান করি। তখন মনের মধ্যে একটা ভয়ের অস্থিরতা কাজ করেছিল। আমার মত একজন অতি সাধারণ ঘরের ছেলে এই বিশাল শিক্ষা প্রাঙ্গণে এসে কাজ করতে পারবে তো? এর পর ধীরে ধীরে ২৬ বছরে অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে কিছু গুণী মানুষের সংস্পর্শে এসে, অনেক গুরুজন স্থানীয় কর্মীদাদাদের, সহকর্মীদের পাশে পেয়ে এবং অবশ্যই প্রতিবছর নতুন নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গ পেয়ে অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি এবং কাজের পরিবেশের সাথে নিজেকে মেলাতে চেষ্টা করেছি। জানি না কতখানি ঠিক বা বেঠিক করেছি বা পেরেছি।

আজ এই শেষ বেলায় এসে শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার মাইতি মহাশয়ের মত অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত দেবাশিস রায়চৌধুরী মহাশয়ের মত উপাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত অসিত মিশ্র মহাশয়, শ্রীযুক্ত শুভায়ন বসু মহাশয় এবং আরও অনেক অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে আরো কত উন্নতভাবে শিক্ষাটাকে ছাত্রসমাজের মধ্যে ছড়ানো যায়, তার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্মচারীবন্ধুদের অফুরন্ত সহযোগিতায় এই শিক্ষা অঙ্গনে শিক্ষায় জোয়ার এনেছে।

তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমার একটি ছোট্ট আবেদন এই যে, নিজেদের ইচ্ছায়, সহযোগিতায় যতখানি সম্ভব এই শিক্ষার জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দাও। গুণী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে জ্ঞানের মধু সঞ্চয় করে নিয়ে সমাজের বুকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ছোটদের আলোর দিশা দেখাও। তোমাদের অভিভাবকরাও যেন জোর গলায় বলতে পারেন, আমার ছেলে-মেয়েকে "আনন্দমোহন কলেজ"-এ পড়িয়ে সমাজের বুকে, বিশ্বের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

এই জন্যেই আমার কর্মস্থল, আমার কাছে এক "স্বর্ণমন্দির"।

ছাত্র-সংসদ কক্ষে ছাত্রেরা

বিভিন্ন সামাজিক কর্মে, উৎসবে অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা

বিখ্যাত শিল্পগোষ্ঠী কর্তৃক পাঠাগারের জন্য অনুদান প্রদান

প্রাক্তনী সম্মিলন ও পুনর্মিলন

কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকেরা

শিক্ষামূলক ভ্রমণে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকেরা

গভীরে যেতে হবে

অধ্যাপক মৃন্ময় মণ্ডল

ভাসা ভাসা মেঘে চড়ে হাওয়ায় দোলার দিন শেষ
খুব গভীরে যেতে হবে। সফেন সমুদ্রতরঙ্গে ভাসমান
মানুষের মিছিল .....বাঁচার আকুতি-কান্না শেষে
অশ্রুরেণু - চিকচিক বালুকণা - শোকার্ত ষোড়শীর
রক্তভেজা বসন - শহিদী আত্মদান যুব-নারীর শিশু-বৃদ্ধের,
মুকুন্দ কবির স্বাধীনতা মূল্যায়ণ - আর কত দিন
ভুলে থাকা যাবে রাউফুন বসুনিয়া-ডক্টর মিলন-
নূরহোসেন- গণতন্ত্রের জীবন্ত স্থাপত্য? রক্তের আল্পনায়
ঢেকে দাও নৃশংস উলঙ্গতা; মুক্তিযুদ্ধ - কালো কফিনে
ঢাকা উপেক্ষিত বন্দিনী - মুক্ত কর সাহসী তরুণ।
এই তোমার হাতে হাত রেখে বলছি - যে বাউল সব ছেড়ে
দেশান্তরি হয় - সব হারিয়ে সূর্যস্নানে ধুয়ে ফেলে বিভ্রান্ত বিবেক
তার কণ্ঠে পরিয়ে দেব শহিদবেদীর অশ্রুভেজা ফুলমালা।

যুগান্তের সাজানো বাগানে মানবতার যে সবুজ বৃক্ষটি ছিল
ওর আজ বড়ই বেহাল দশা। বেহাল দশা হুইলচেয়ারে বসা
শাশ্রুশোভিত আহত মুক্তিযোদ্ধার - শত্রু অবরুদ্ধ আমার দুঃখিনী বাংলাদেশ।
একাত্তরের সেই সাপ - সেই বিভ্রান্তি - সেই মানুষ-মারা দানব
সেই সপ্তম নৌবহর - সেই বৃক্ষবিনাশী ভয়ঙ্কর নিয়ত বদলায় খোলস
এখনো মানুষ ছেড়ে যায় দেশ, এখনো মানুষের মুখে সেলোটেপ
এখনো লোভের লোলুপ জিহ্বায় রসহরি ছুড়ে মারে রসালো টোপ
এখনো উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ, প্রতারণা জালিকায় ঢাকা চারদিক, অমাবস্যা রাত।

গভীরে যেতে হবে, তুলে আন কৃষ্ণ আঁধার, জলতলে জিঘাংসা গরল
নিজের মধ্যে সর্পবাস ভেঙে ফেল বিপরীত জটিল কুটিল প্রবৃত্তি পাশবিক
সমুদ্রে নেমেছে দেখ হিংসুক হাঙ্গর নিষ্পাপ মৎসকন্যা আহত জরজর
মিথ্যার বন্যায় গর্ভবতী গোলাপ করে বিকৃতি ধারণ মোটা মহারাজ তুষ্ট ভীষণ
সৌন্দর্যের মুখে কালোছাপ নিলাজ তবুও মুখ তুলে দেখে ভূমিষ্ট এক বেহায়া বাঁদর

গভীরে যেতে হবে, অতল গহীনে যদি ধরা পড়ে নষ্ট প্রজাপতি
মানুষ বেঁচে যাবে, যাবে থেমে শোকার্ত ক্রন্দন, সবুজ বৃক্ষ পাবে স্বস্তি
বধির আর অন্ধদের নিয়ে বসবাস শেষ হোক, গভীরে যাও সন্ধানী চোখ
গভীরে যেতে হবে, কপট নিরীক্ষা আর নয়, অতলে উত্তোলিত হোক রুগ্নতার কারণ।

প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি বিভাগ), আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ,
অধ্যাপক নিমাই মণ্ডল 'মৃণ্ময় মণ্ডল' নামে কবিতা লেখেন।

রোদ্দুর

ড. সনৎ চট্টোপাধ্যায়
(শারীরবিদ্যা বিভাগ)

সবার মধ্যেই কিছু ঢেউ থাকে
থাকে কিছু ঝিনুক, কিছু ঝিক্‌মিক্‌ রোদ্দুর
কেউ কেউ খোঁজ পায় তার
কেউবা অন্ত্যহীন খুঁজে বেড়ায়
কিম্বা হারিয়ে পথ
দাঁড়ায় মনের অনতিদূরে।

মসীমাখা মেঘ জলে
আকাতরে ভিজেছে কেউ কেউ
ভেঙে যাওয়া ঢেউয়ে আছড়ে পড়েছে কেউবা
কেউ হেসেছে অনন্ত
কেউ খেলেছে তারও চেয়ে বেশি
কেউবা তলিয়ে গেছে অতল গভীরে
কেউ সাঁতরেছে কিছুটা দূর।

কিছুই অসম্ভব নয়, সবই নিরন্তর
বিস্ময় লাগে না কোন কিছুতেই
সবার চোখেই তো থাকে জল
তবু কারোর চোখ থাকে নিরুদক
কারোর নয়ন সদা অশ্রু ছলছল
কেউ কেউ খুঁজে পায় জীবনের সব নির্ঝর
কেউবা আজীবন রয় পিয়াসী, নিরুত্তর।

আপাত আসল কথাগুলি হয়
জীবনের ঢেউ, মেঘ আর জল
তবে দিনান্তে ফুরাবে যখন সব কলরব
থেমে যাবে সব কোলাহল
সূর্য ডোবা সন্ধ্যায় সবে বেজে উঠবে
চেনা একতারার সুর
তখন সব আঁধার সরিয়ে প্রকাশ পাবে শুধুই
ফেলে যাওয়া সেই এক চিলতে রোদ্দুর।

চিরায়ত

অধ্যাপিকা ঋতা রায়
(বাংলা বিভাগ)

আজ যদি মন বলে, 'চিনি উহারে',
কাল কেন মন বলে, 'ডেকো না তারে'।
আজ যদি মন বলে, 'ভালবাসে জেনো',
কাল কেন মন বলে, 'ঠিক নয় জেনো'।
আজ যদি মন বলে, 'সুন্দর ভারি',
কাল কেন মন বলে, 'আড়ি, আড়ি, আড়ি'।
আজ যদি মন বলে, 'কথা নয় আর',
কাল কেন মন বলে, 'আরও একবার'।
* * * * * *
এই ভাবে আজ আর কাল মিলেমিশে,
দেখা হয়, কথা হয়, পাশাপাশি হেসে॥

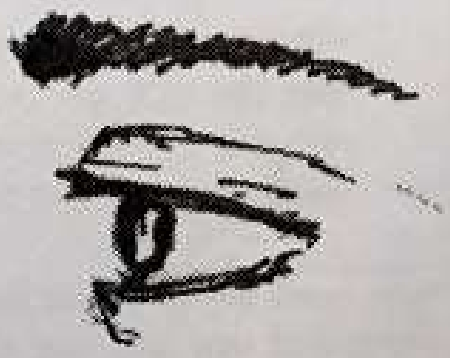

লিমেরিক

অধ্যাপক শুভায়ন বসু
(বাণিজ্য বিভাগ)

ভাবনা

মণিপুর নিবাসী নরহরি কাক
বাজারে সেতারী বলে ভারী নাম ডাক
ভেবে তিনি হলেন সারা
বাজিয়ে পঞ্চম সে গারা
মাথাজোড়া গজাল কেন মস্ত বড় টাক?

হুজুগ

প্রতিমার মাথা ছাড়িয়ে সাতাশি বাঙালি জনতা উদ্বেল
বুড়ো গুঁড়ো ছোটে মাতা দরশনে কেউ পাশ আর কেউ ফেল
বিজ্ঞাপনের ফানুসেতে চেপে
হুজুগ নেমেছে জীবনেতে ঝেঁপে
রঙ্গপ্রিয় বাঙালি সমরে ব্যাট হাতে যেন ক্রিস গেল।।

আলোকিত উচ্ছ্বাস

দেবাশিস গাঙ্গুলী
(হিসাব রক্ষক, আনন্দমোহন কলেজ)

আলোর বিন্দু বা আলোর বৃত্ত
যেভাবেই হোক আলোকিত চিত্ত।
তার যে রূপরেখা উজ্জ্বলতর হবেই হবে
আজ কিম্বা কাল
সূর্যে ত হয় না কখনও আলোর আকাল।
মেঘও বড় অপূর্ব বিভাজিত হয়
সূর্য্যসোনা আবছায়াতে।
যেভাবেই হোক না কেন
আলো থাকে চিরকাল স্বপ্নমায়াতে।
অমাবস্যা যদিও বা আসে
সে তো একদিন
বাকী সময় আলোর বিভাস
কমবেশী রঙিন
আলোর চর্চা, ভালো চর্চা চলুক বহুদিন—
ঝলমলে আলো দিয়ে মেটাব
আঁধারের ঋণ।
এলোমেলো লিখে দিলাম
আলোর সংবাদ
আসলে মন শুধু বলে,
আলোকিত উচ্ছ্বাস জিন্দাবাদ।।

বিশ্বজিৎ মাইতি-এর কবিতা
প্রাক্তন ছাত্র-২০০৩ (বাংলা বিভাগ)

জল-খুকু

জলটি পেয়ে মনটি ভরে
আমার খুকু স্নানটি করে
বালতি ধরে গানটি করে
কাপড় কাচে মুগুর মেরে।

খুকুন সোনা খুকুন সোনা
আমার কোলে আয়রে ফিরে
জ্বর আসবে ধীরে ধীরে
কাঁপবে সবাই থরথরিয়ে।

সূর্যি নামে পুকুর পাড়ে
আমার খুকু নাচটি ধরে
একটু পরে পিছলে পড়ে
সাঁতার কেটে ইলিশ ধরে।

না-ধরার গল্প

মেয়েটির বুকে ভালোবাসা ঠিক যেন
শ্রাবন্তীর ঝড়
আর
মাংসে পাগল বালক
ভালোবাসা না ছুঁয়ে
হয়ে যায় অন্ধ সরীসৃপ

মেয়েটির বুকে ভালোবাসা হয়ে ওঠে
আর্য সত্য কিংবা তিন চরণের কবিতা
আর
মাংসে পাগল বালক
ভালোবাসা না ছুঁয়ে
হয়ে যায় শূন্য প্রেতাত্মা
সম্পর্কে প্রাচীন গ্রহান্তরে

আশ্চার্য এক স্বাদে জেগে থাকে সুখ....

শীতের বেলা

ধানের খেতে চাষার ছেলে
ফসল তুলবে ঘরে।
পৌষমাসের মেঘের বেলা
শীত পড়েছে জোরে।

হিংচে ইলিশ পুঁই শাক
বাড়ছে ফুলের সাজে।
গাঁয়ের বধূ জল দিয়ে যায়
ভরা খেতের মাঝে।

খেজুর গাছে রস জমেছে
পিঠে হবে খাসা।
হোসেন মিঞা পাল তুলেছে
মাছ আনবে ঠাসা।

দুষ্টু ছেলে দামাল ছেলে
ফেলছে জামা খুলে,
এদিক ওদিক না তাকিয়ে
নিচ্ছে বেগুন তুলে।

নিভে যাওয়ার আগে...

বিশ্বজিৎ মাইতি
(প্রাক্তন ছাত্র-২০০৩, বাংলা বিভাগ)

শোনো বন্ধু—
আজ সব ইচ্ছেগুলো আগুন হয়ে যায়
আজ সব স্বপ্নগুলো নুড়ি হয়ে যায়
আর মানুষগুলো মহাভারতের মধ্য লগ্নে খসে পড়ে
তুমি-
এসব কথা আমাকে শোনাও কেন?
আমি তো বেশ ভালো আছি জলে ভেজা রক্তে মাংসে।

শোনো বন্ধু —
আজ সব পাখিগুলো নীলকণ্ঠ হয়ে যায়
আজ সব কুঁড়িগুলো ফুটতে ভুলে যায়
আর মাটি সে তো পাথর হয়ে যায় সভ্যতার সাথে
তুমি —
আবার এসব কথা আমাকে শোনাও কেন?
আমি তো বেশ ভালো আছি রাত জোনাকির শয্যাঘরে।

শোনো বন্ধু —
আজ সব মুখগুলো বধির হয়ে যায়
আজ সব বিপ্লবগুলো বেতাল হয়ে যায়
আর শিশুগুলো অন্ধ হয়ে যায় ফর্সা চাঁদের আলোয়
আবার, আবার এসব কথা শোনাও আমায়
আমি বেশ ভালো আছি ভাঙা পাঁচালির জ্যান্ত দেহে।

তুমি ঘুমাও বন্ধু, অনেক রাত হয়েছে
শরীরের উল্লাস তোমায় গ্রাস করেছে শ্রাবন্তীর ঝড়ে

তবুও বেঁচে থাকতে হয়—
গভীর থেকে গভীরতম নিঃশ্বাসে কিংবা
সহস্র শতাব্দীর আগে নিভে যাওয়া রাবণের চিতায়।

এখনকার ছেলেমেয়ে

শ্যামসুন্দর পাত্র
(প্রথম বর্ষ, বি. এসসি.)

এখনকার ছেলে মেয়েরা
কথা কারুর শোনে না।
কোনটা খারাপ কোনটা ভালো
চিন্তা করে দেখে না।
যখন যেটা ইচ্ছে হয়
তখন সেটা করে—
খারাপ কাজে বাধা দিলে
উগ্র মূর্তি ধরে।
যখন তারা বুঝতে পারে
আমি করেছি ভুল—
নিজের উপর রেগে গিয়ে
ছেড়ে মাথার চুল।

শেয়াল পণ্ডিত

উমেশ পাল
(প্রথম বর্ষ, বি. এসসি.)

বুড়ো শেয়াল খালের ও ধারেতে
পারে নাকো লাঠি ছাড়া হাঁটিতে।
ভোর বেলা যেতে যেতে পথেতে
দেখা হল কুমিরের সাথেতে।
বল্লো কুমির বল্লো পাঠশালাতে
যাব আমি সঙ্গে সাত ছানাতে।
তোমার কাছে শিক্ষা ওরা পেলে গো,
রত্নে তব ভাঁড়ার ভোরে দেব তো।
তাই না শুনে বুড়ো শেয়াল উল্লাসে
ঘরে গিয়ে নাচ লাগল খুব কষে।
সাত দিনেতে সাত ছানাকে পেটে পুরে
শেষে শেয়াল পালিয়ে গেল বহু দূরে।

মন

অভিষেক চ্যাটার্জী
(প্রথম বর্ষ, বি. এ.)

এই জীবনের সকল হাসি
কান্না যদি হয়।
মায়ের মত আমার ব্যথা
কেউ তো বুঝবে না॥
স্বপ্ন পথের অন্ধকারে
থামতে যদি হয়।
হাত বাড়িয়ে বাবার মত
কেউ তো খুঁজবে না॥
মা ছাড়া আমায় তো আর কেউ বুঝবে না।
আমি চলতে ভালোবাসি
দাদার পাশাপাশি।
আমি দেখতে ভালোবাসি
বোনের মুখে হাসি॥
এতো ভালোবাসা ছেড়ে
দূরে সরে থাকা।
কবিতারা আছে তবু
আমি বড় একা॥

আমার গর্বিত বাংলা

দীপ কুণ্ডু
(প্রথম বর্ষ, বি. এ.)

বাংলা ভাষা, বাংলা আশা, বঙ্গ সন্তান আমি,
বাংলা গানে সুরের ভাণ্ডার ভরিয়েছ তুমি।
বাংলা কথা, শব্দ, অক্ষর ভীষণ ভালোবাসি,
শিক্ষার আলো প্রতিটি আলয়ে জ্বালিয়েছ তুমি।।

বাংলার সুন্দর রূপ দেখেছি তোমার চোখে,
তোমার কবিতা, গানের সুর মনোপ্রাণে ভাসে
শত প্রণাম তোমার চরণে হে বঙ্গ সন্তান,
অন্ধের কুটির আলো করে তোমার অবস্থান।।

বাংলা আমার মাতৃভাষা, এ দেশ পিতৃভূমি,
সেখানেই থাকি মনে প্রাণে বাংলা ভালোবাসি।
সন্ধ্যা প্রদীপ আজও জ্বলে বাংলার কুটিরে,
নববর্ষে আনন্দ করি বাংলা মায়ের কোলে।।

শরৎ-এর অম্বিকা পূজা জানে জগৎ জনে,
প্রস্ফুটিত কাশফুল আর শিউলির গন্ধে ভাসে।
মানব জনম সার্থক করল এ জন্মভূমি,
সার্থক জনম আমার, তোমায় আমি প্রণমি।

তুমি আসবে বলে

অংশুমান পতি
(দ্বিতীয় বর্ষ, বি. এ.)

রাত্রি যখন অনেক হল আকাশ তখন স্তব্ধ,
আক্রান্ত হলে তুমি গভীর ভাবে।
জানি, আর ফিরবে না তুমি কখনও
এখন শুধুই শূন্যতা, হতাশা
আমায় বাজাতে হবে স্মৃতির ঝুম ঝুমি।
স্মৃতি ভালোবাসা রাখে পাথরের পাশে,
পুরোনো স্বপ্ন যদি ফিরে আসে।
গেলে তুমি অচীনপুর, অজানা এক দেশে।
তবুও আমি শূন্যে চেয়ে পড়ে থাকি—
তুমি আসবে বলে।

জিজ্ঞাসা

সৌম্য সাঁতরা
(প্রথম বর্ষ, বি. কম)

রবিবারটা খেলার জন্য
পড়ার জন্য নয়,
সোমবারেতে পড়তে গেলেই
মাথা ব্যাথা হয়।
মঙ্গলবারে পড়লে নাকি?
অমঙ্গল হয়,
বুধবারেতে পড়লে নাকি
বুদ্ধি খরচ হয়,
বৃহস্পতিবারে পড়লে বাড়ে
মা লক্ষ্মীর ক্রোধ,
শুক্রবারে সকাল থেকে
নাটক শোনার ঝোঁক।
শনিবারেতে হাফ ছুটি
বেড়াতে চলে যাই
বলতে পারো কখন আমি
পড়ার সময় পাই।

নির্জনতা

অংশুমান পতি
(দ্বিতীয় বর্ষ, প্রাণীবিদ্যা)

গলির কোণেতে কে ওই দাঁড়িয়ে আছে?
একাকী উদাসীন ভাবে
যেন সে, কিছু খুঁজে চলেছে
কিছু পেয়েছে হয়তো সে
কিন্তু রয়েছে বাকি,
জানি না, আর পাবে কিনা সে
অসহায়তার কালি মাখা মুখ
নিষ্পলক তার চোখের পাতা
উদাসীনতার এই ফাঁক
ভরাট করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।
একাকী এক গলির কোণে।

তন্ময় মণ্ডল-এর একগুছ কবিতা
(প্রথম বর্ষ, প্রাণীবিদ্যা)

ভয় নয় ঃ ভয় নয়

এই যে দূরে নীলিমা
পদ্মা নদীর পারে।
ঝলমলে জল রাশি
উথলিয়া পরে।
এই পারে বালুচর,
সুরে সুরে বলে
তোমার কী মাথা খারাপ;
পড়ে আছে এই শ্মশান পারাবারে।
গিয়া দেখ ঐ পারে
আছে কত সুখ।
কোকিলের মধুর সুর
ভরাবে তোমার বুক।

আমি বলি ওহে বন্ধু
কী করে তোমায় বোঝাই
সামনে যে মোর রাক্ষুসী নদী
লাল রাঙ্গা চোখে মোর দিকে তাকায়।
লাগে আমায় বড়ো ভয়
শিহরণ দেয় গায়ে।
ভাবতে গিয়ে মাথা ধরে
ঝিম্ ঝিম্ করে হাতে পায়ে।

বন্ধু তুমি মিছে ভাবো
সে রাক্ষুসে নয়।
দিবা রাত্রি নাহি ঘুমায় সে
তাই চক্ষু তাহার লাল।
তোমায় নিয়ে পারে যাবে
তাই তোমার দিকে তাকায়।
ঝাঁপ দিয়ে উঠে পড় তুমি
তাহার কাঁধের উপরে।
হাত, পা, নাড়াও শুধু
সেই নিয়ে যাবে পারে॥

বর্তমান সমাজ

ভাবতে আমার অবাক লাগে
কলকাতার এই পথ;
চিনতে আমার ভুল হয়ে যায়
এই দেশের জন সমাজ;
বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর
জন্মেছে যে দেশে—
আজও কেন অশ্রু ঝরে।
অন্ধ মায়ের চোখে?
দেখি কেন আজ;
ছোটো খুকি, ভিক্ষুকের বেশে?
পথে কেন শুয়ে থাকে
প্রবীণ ভারতবাসী?

তবে কী ভুল আম্বেদকারের
রচিত "সংবিধান খানা।"
মিছে কি তবে দেশ প্রিয়দের
নেওয়া শপথ গুলা।
ভুল কী তবে
গুরুজনদের দেওয়া উপদেশ গুলা।

ভুল নয়—
গুরুজনদের এ হেন বাক্য গুলা।
ভুল নয়—
আম্বেদকারের সেই সংবিধান খানা।
ভুল শুধু—
অর্থলোভী, পিশাচদের নেওয়া শপথ গুলা।।

পঞ্চমীর রাত

কি সুন্দর অর্ধেক মিঠি মিঠি চাঁদ
উঁকি মারে আকাশে।
কালো কালো মেঘের পাশের
আধফালা চাঁদ দেখে, মনে হয়
কেউ যেন অজস্র ঝিনুক মালার মধ্যে
একটু কারা মুক্ত ছড়িয়েছে।
নারিকেল গাছটি এক পায়ে দাঁড়িয়ে
শত কষ্টের মধ্যেও, এই রূপ দেখে
মনের আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে,
মৃদু মৃদু হাসে,
হালকা ভাবে চুল নাড়া দেয়।
গছের নীচে ভাঙ্গা দালান ঘর—
যেখানে কেউ থাকে না, পেতনীর ভয়ে।
থাকে শুধু ছোট ছোট কাঁটা আর গুল্ম।
কেউ না থাকা সেই দালান ঘর
একবার নিজ কষ্ট ভুলে দেয় মাথা নাড়া।
ফিস্ ফিস্ করে হাসে, আর
যেন সেই হাসির মধ্য দিয়ে
বার বার আমাকে ডাকে;
বলে আয় না তনু
একবার আমাদের সাথে খেলা করে যা,
এই মিটমিটে চাঁদের আলোয়—
আমাদের বুকটা ভরিয়ে দিয়ে যা।

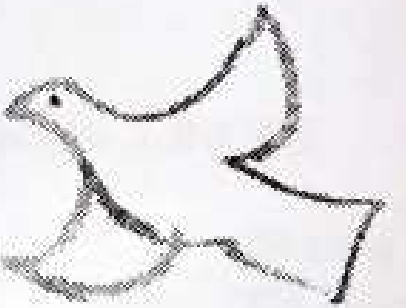

খরা

শূন্য হয়ে গেছে—
গ্রামের পর গ্রাম, ফাঁকা হয়ে গেছে।
গাহিছে না গান কেহ—
ভাটিয়ালি সুরে।
চরাইছে না গরুর পাল
ধরিছে না মাছ কেহ
পদ্মানদীর পারে।
নৌকাগুলি পড়ে আছে—
নিস্তেজ ভাবে।
চঞ্চল স্রোতের ধারা স্থির হয়ে
সেও যেন কাঁদে।
জমির কাঁচা ধান
হলুদ হয়ে গেছে।
মাটি হাঁ করে আছে—
সে যেন জল চায়।
শেষ হয়ে গেছে
গ্রামের পর গ্রাম, ফাঁকা হয়ে গেছে।
উঠিছে না উলুধ্বনি গৃহে গৃহে
বাজিছেনা শঙ্খ।
ঝলসানো, শুকনো বিমর্ষ এক গাছে
জিজ্ঞাসিলাম বারে বারে
নাহি পারে বলিতে সে
শুধু চুপ করে কাঁদে।।

পুঁচকে ছেলে

কী জানে এই পুঁচকে ছেলে
বয়সটি যার পাঁচ।
কোনো মতে হেসে খেলে
করছে বাড়ি মাত,
কোণের ঘরে পুতুল সাজিয়ে
বাঘ, সিংহের যুদ্ধ বাধিয়ে
লাথি মেরে ফেলে দিয়ে।
বুক ফুলিয়ে বাইরে আসে—
মায়ের কোলের মধ্যে বসে
গর্ব করে বলতে থাকে
তার ঘরের নিপুণ কাজ।
যারা সিংহের জীবন দিয়ে
কানটি ধরে ছিঁড়ে দিয়ে
স্বর্গ, মর্ত্য-পাতাল ঘুরে
ফিরে এসেছে মায়ের কাছে।
মায়ের কাছে বাহবা পেয়ে,
চিৎকার করে বেরিয়ে পড়ে।
বাচ্চারা ভয় পেয়ে
তাকে দেখলে
সেলাম করে॥

মরীচিকা

এই দুনিয়া ধু ধু বালুরে
কোথাও নেই এক বিন্দু বারি।
এই যে দূরের মরীচিকা
নিয়ে আসে সুখের বার্তা।
ক্লান্তি ভরা এই দুপুর
মনে হয় তখন একটু মধুর।
এগিয়ে যেতেই তাহার ধারে
বাষ্প হয়ে যেন উবে যায় রে,
এই দুনিয়ার মরীচিকা—
দিয়ে যায় শুধু মোদের ব্যথা।

এখন মনে হয় সত্যি কথা
পার্থ স্যারের সেই ভাষা—
"মোদের এই জীবন, ক্ষুদ্র জীবন,
দুঃখে ভরা দিন—
ও সব কথা না ভেবে
মোরা, সবাই এগিয়ে যাব নিজ নিজ—
লক্ষ পারাবারে॥"

বর্ষার সকাল

ঝম্ ঝম ঝম্ বৃষ্টি পড়ে
শান্ত পুকুরে।
ছোট ছোট পোনা খেলা করে
সেই পুকুরে॥
বৃষ্টি থামলে;
ঘ্যাং ঘ্যাং ডাকে ব্যাং
উতলা হয়ে।
ছোট ছোট কীট বসে থাকে
জলের উপরিতলে।
হালকা মৃদু মৃদু বাতাস বয়
মাটি ভেজা গন্ধ নিয়ে।
হালকা রোদের আভাস পড়ে পুকুর পাড়ে
ঝলমল করে ঘাস।
সমগ্র পুকুর আনন্দে উতলা হয়ে
করে টলমল।
যেমনটি এক সন্তান হারা মা
নিজ সন্তান পেয়ে
হয়ে ওঠে উতলা॥

প্রাণের পাখি

হায়রে প্রাণের পাখি উড়ে গেলে তুমি
ঘন বনের মধ্য দিয়ে।
এক বার চেয়ে দেখ কতশত পাখি
বসে রয়েছে তোমার চিন্তায়।
একবারও বুঝিলে না আমার ও মায়ের মনের জ্বালা
কি যে হয়ে পড়ে আছি
তোমার অপেক্ষায়।
বুক চিরে গেলে তুমি সবাইকে চিন্তায় ফেলি
আর কী কেউ বুঝিল না তোমায়?
মনে কত সাধ ছিল তুমি হবে মহারাণি।
চলে গেলে তুমি
সবার মাথা নিচু করি।
বুকে কত ব্যথা চাপিলেও কাঁথা
ঘুচাইতে পারিবে না কেহ।
ফিরে এসো তুমি সব কিছু ছাড়ি
থাকিবে না কোনো চিন্তা।
আবারও মন ভরাব জোড়া লাগার মনকে
যে মনকে ভেঙেছিলে তুমি॥

অকাল পতন

হঠাৎ চমকে দেখি—
এত সুন্দর চিলটা,
যেটা উঠে ছিল আকাশে
সততার রূপ নিয়ে;
সবাইকে ভালো বেসে।
উপরে উঠতে সে—
ভুলে গেল পূর্বের রূপখানি।
বেছে নিল অসত্যের পথ।
দেখতেই শিকার
ঝুপ করে পড়ে,
এই রূপ দেখে শিকারীগণ
নিহত করে তাকে।
মরে যায় অসৎ
আকাশ হয় নীল।
আবার নতুন করে নতুন
এক সৎ-এর আভাসে, সৎ
উদয় হয় পূর্ব আকাশে।
সে যে আসলেই সৎ,
কখনও করে না বঞ্চনা।
করে না অত্যাচার ছোটোদের পরে
করে শুধু অত্যাচারী বদমাসদের যখম॥

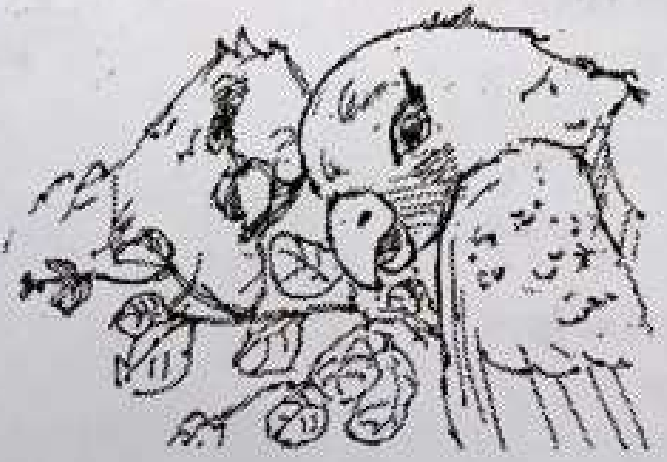

বৃত্ত

ড. মিলি দাস
(অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা)

পঁচিশে পা দিতেই শ্যামলা ছিপছিপে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বড় সংস্থায় কর্মরত। শ্বশুরবাড়ী মফঃস্বল শহরে ব'লে বাড়ীর লোকজনের কেমন যেন একটা মনমরা ভাব। উত্তর কলকাতার বনেদী পরিবারে বড় হওয়া মেয়েটির বিয়ের পর মানিয়ে নিতে বেশ অসুবিধা হলেও বলার জায়গা ছিল না বললেই চলে। বরাবর শান্ত, সংযত, ধৈর্য্যশীল মেয়েটি কিন্তু যথাসাধ্য মানিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সংসারধর্ম পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। স্বামী অবশ্য তার মুখের প্রতিটি রেখার অভিব্যক্তি প'ড়ে ফেলতে পারত এক লহমায় - এইটাই ছিল তার একমাত্র সম্বল। আশৈশব সকালে খবরের কাগজ পড়া আর বরাবর ইস্কুলে প্রথম হওয়া মেয়েটির সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে গিয়ে পড়তে বসা - এই চিরাচরিত অভ্যাসে ঈষৎ বাধা পড়ল সংসারের কাজ করতে গিয়ে। স্বভাবতই কর্মস্থলে একটু পিছিয়ে পড়তে থাকায় চোরা এক ক্ষোভ দানা বাঁধছিল - মাঝেমধ্যে তার প্রকাশও হয়ে পড়ত লাগামহীন। এমনি করে একদিকে সংসার ও অন্যদিকে কর্মস্থলে টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত মেয়েটি একদিন জন্ম দিল শ্যামলা এক মেয়ের। 'দিশা'-র আগমন এক ঝটকায় জীবনের গতিপথ ঘুরিয়ে দিল; প্রতিরাত্রে কাঁথা বদলাবার জন্য একটানা না ঘুমোনো অভ্যাসে পরিণত হ'ল। ক্রমে দিশা উপুড় হওয়া শিখল; মাতৃত্ব-কালীন ছুটিতে দিশাকে স্নান করিয়ে রোদে কোলের মধ্যে শুইয়ে কাজলের টিপ পরিয়ে দেওয়াতেও এক অনাস্বাদিত আনন্দের আভাস পেতে লাগল মেয়েটি। ঘুমিয়ে থাকাকালীন কচি, নরম হাত-পায়ের নখ ব্লেড দিয়ে কাটা বা ভ্যাক্সিনের জায়গার পুঁজ সেফ্‌টি পিন দিয়ে বের করে দেওয়াটাও ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। এরই মধ্যে দিশা একটু একটু ক'রে হামাগুড়ি দেওয়া ও দাঁড়িয়ে পড়া শিখে ফেলল। ছোট্ট দিশা আনন্দে ভরিয়ে রাখলেও মায়ের জন্য বেঁধে দেওয়া সমাজের তথাকথিত নিয়মাবলীর ফাঁসে মেয়েটি হাঁপিয়ে উঠল।

আজ আয়া আসবে না - মা অফিস্ যেতে পারবে না। আজ দিশার জ্বর- মা অফিস্ যাবে না। আজ দিশার পেটে ব্যথা - মা অফিস্ যাবে না।

তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার উচ্চপদে কর্মরতা মেয়েটি কর্মজগতে নিজের পিছিয়ে পড়াটা মন থেকে মানতে পারছিল না। দিশাকে ছেড়ে তার স্বামী কাজের সূত্রে দেশে-বিদেশে যেতে পারে, কিন্তু মা গেলেই গেল-গেল রব। স্বামীর মানসিক সহায়তায় প্রজেক্টের কাজে যদি বা যায়, তাও একটা অপরাধবোধ কুরে কুরে খায় মেয়েটিকে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে প্রমাণ করতে না পারার হতাশা জন্ম দেয় এক অন্য সম্পর্কের। পুরুষের আগুনে দৃষ্টির সামনে বিহ্বল লাগে- দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় মন। তখনো দিশার কাজগুলো সে মন দিয়েই করে, কিন্তু দিশাকে অনুভব করতে পারে না। ইতিমধ্যে কোম্পানি থেকে একটা বড় কাজের সংবাদে স্বামী বেশ কিছুদিনের জন্য বিদেশে চলে যায়। দিশাকে নিয়ে বড় একলা হয়ে যায় মেয়েটি। কর্মক্ষেত্রে অন্য এক সম্পর্কের দুর্মর আকর্ষণের বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চিপে প্রতিরোধ - পরিণাম অবসাদ, মনোবিদ, কাউন্সেলিং, প্যানিক্ এট্যাকের একগুচ্ছ

ট্যাবলেট। জীবন তার থেকে অনেককিছু কেড়ে নিলেও দিল এক অনন্য অনুভূতি। দিশাকে সে আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে শিখল ; বুঝতে পারল ছোট্ট দিশার মুখের নির্মল হাসি দিয়ে দিনটা শুরু করে সারাদিনের সমস্ত কাজের পর দিশার কাছে ফিরে আসার নামই জীবন। দিশা এখন একটু বড় হয়েছে। ইস্কুল থেকে এসে মার সাথে আয়ুষ কীভাবে টিফিন ব্রেকে 'লুঙ্গি-ডান্স' নাচল তার গল্প করে। সকালে মায়ের প্রেশারের ওষুধ দেওয়া থেকে ময়লা ফেলা, মা ব্যস্ত থাকলে টুকটাক দোকানপাট, সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ধূপ দেওয়া, সবেতেই ডাক পড়ে দিশার - এমনকি রাতে ঘুমের ওষুধ প্রয়োজন হলেও নিঃসঙ্কোচে দিশাকে বলে মা। মায়ের আবৃত্তির অনুষ্ঠানে পরার শাড়ীর সাথে দুল বা লিপস্টিকেও দিশা তার মূল্যবান মতামত জানায়। মাঝে-মাঝে ওর মা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবে এইটুকু বয়সে কীভাবে জীবনের সারসত্য বুঝে গেল সে, তাকে তো সেভাবে কেউ কিছু শেখায়নি। স্কুলের বায়োলজি পড়ে এসে দিশা যেমন তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে তো তার মায়ের গর্ভজাত, তাহলে তার শরীরে বাবার রক্ত এল কীভাবে? ওর মাও তেমনি অফিসে কোন সমস্যা হলে ওর সঙ্গেই আলোচনা করে। ক্রমে মা-মেয়ের মধ্যে এক নিবিড় সখ্যতা তৈরি হয়। দিশার মধ্যেই সে নিজেকে খুঁজে পায় আর মনে মনে ঈশ্বরকে এই অনবদ্য পুরস্কারের জন্য ধন্যবাদ জানায়। এখন দিশার নাক দিয়ে রক্ত পড়লে বাবাকে ফোনের প্রয়োজন হয় না, ১৪ দিন ধরে জ্বরাক্রান্ত মেয়ের জন্যে রাত জেগে জলপটি দেওয়ার সময় তার ক্লান্ত লাগে না, দিশার পেটে ব্যথা হ'লে অফিসে যাওয়ার শাড়ী ছেড়ে ফেলার সময় একবারও সে অভিযোগ করে না বাবা কেন অফিসে যাবে? উলটে হজমের গণ্ডগোল ব'লে তড়িঘড়ি বাজার থেকে মাগুর মাছ এনে কাঁচাকলা দিয়ে রেঁধে দিয়ে এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি বোধ করে সে। এই প্রথম সে বুঝতে পারে যে শুধু জন্ম দিলেই যথার্থ মা হওয়া যায় না। প্রকৃত মাতৃত্ব উপভোগ করার জন্য চাই জীবনের বেশ খানিকটা অমূল্য সময়। অফিসে ওর চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন রত্নাবলী মিত্র পরের প্রজেক্টের দায়িত্ব পেলে সে একটুও ঈর্ষান্বিত হয় না। ফিরে এলে পদোন্নতি নিশ্চিত জেনেও বিদেশ যেতে পারল না ব'লে তার দুঃখবোধও হয় না। কারণ এখন সে বুঝে গেছে, জীবনে কিছু পেতে গেলে দিতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। লণ্ডন থেকে যে টিম এসেছে ওর অফিসে, তাদের সম্মানে তাজ-বেঙ্গলের ব্যাঙ্কোয়েটে গেলেও ডিনারের আগে দ্রুত পদে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিকে বলতে পারে 'যোধপুর পার্ক'। পিছনে পড়ে থাকে সাইকেডেলিক্ আলো, পার্টির হই-হুল্লোড়, সেই পুরুষ একদা যার সংস্পর্শে শরীরে শিহরণ জাগত। আজ আর এসব তাকে একটুও ভাবায় না। চল্লিশ মিনিট পর ট্যাক্সি পৌঁছে যায় তার অনিবার্য গন্তব্যে, যেখানে অপটু হাতে পিয়ানোয় বেজে চলেছে -

Edelweiss............Edelweiss...........

১৮৫৭ ঃ উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী প্রসঙ্গ

ডঃ সুব্রতকুমার মাল

১৮৫৭ সালে ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সিপাহিদের বিদ্রোহ কেবল 'সিপাহি' বিদ্রোহ ছিল না; এদেশের বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণ করার ফলে এ বিদ্রোহ বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মহাঅভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে। বিদ্রোহীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শাসনের অবসান ঘটিয়ে গোটা দেশকে স্বাধীন করা। এই কারণে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাদের সমকালীন এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে The First Indian War of Independence অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করেননি। যদিও এই অভ্যুত্থান উত্তর ভারতের মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমাদের এই ভারত উপমহাদেশ যেটিকে এখন দক্ষিণ এশিয়া বলে অভিহিত করা হয়—এই ভূখণ্ডটি আঠারো শতকে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত কখনো এক অখণ্ড রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে থাকেনি। এমনকি পরাক্রমশালী মোগল সম্রাটরাও সমগ্র ভূখণ্ডকে জয় করে তাদের একচ্ছত্র অধীনে আনতে বা ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি।

আঠারো ও উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনামলেই ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই উপমহাদেশ রাষ্ট্রীয় অর্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আবার বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর এই ভূখণ্ডটি আবার বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে প্রথমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়; পরে ১৯৭১ সালে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, রাষ্ট্রীয় বিভাজন সত্ত্বেও এই গোটা উপমহাদেশের মানুষ এক অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ইওরোপ, আমেরিকা তথা সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়া যেমন বহুবিধ রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এক অবিভাজ্য সভ্যতার ধারক; সমগ্র আরব ভূখণ্ড এবং আরবি ভাষাভাষী উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও এক বিশিষ্ট আরব সভ্যতাকে বহন করে, তেমনি আমাদের ভারত উপমহাদেশ—ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ যেটি এখন দক্ষিণ এশিয়া নামে পরিচিত এই বিশাল ভূখণ্ডের মানুষ বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও এরা সবাই একটি প্রাচীন এবং সুমহান সভ্যতার উত্তরাধিকারী ও ধারক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত নরগোষ্ঠী এ ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করেছে এবং কালক্রমে এই অঞ্চলের আদি ও প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে এক অনন্য সমন্বয়ধর্মী সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। এই সভ্যতার মধ্যে যেমন রয়েছে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য, তেমনি এই বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখতে পাই একটা আশ্চর্য ঐক্য—যেটাকে ঐতিহাসিকরা বলেছেন ঃ Unity in diversity; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বৈচিত্র্যের মধ্যে 'সুর-সঙ্গতি' বা 'Harmony' এটি কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু অনেক সময় অনেক পুরানো কথাকে আমরা ভুলে যাই কিংবা নানা কারণে ভুলে যেতে চাই।

বর্তমান সময়ে ধর্ম ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিয়ে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘাত জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে—এই ধরনের হিংসাত্মক বিরোধ কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের আগে এ উপমহাদেশে দেখা যায়নি। ব্রিটিশ রাজত্বকালে নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে যে সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব হয়েছিল সেটা এখনো নির্মূল করা সম্ভব হয়নি, বরং নানা কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা যেতে পারে, গত শতকের চল্লিশের দশকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম আকারে ধারণ করে, যার পরিণতি হয় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তখন অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, ব্রিটিশ ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করে যদি স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তাহলে সংখ্যালঘু বা সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে; কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে এই উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার

সমাধান তো হয়ইনি, বরং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার আমাদের সময়েই ১৯৭১ সালের বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ফলে এই উপমহাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো খণ্ডিত হলো। কিন্তু এবার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নয়, এক নয়া আঞ্চলিক বা ভূভিত্তিক এবং ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে একটি নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র—বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। কিন্তু এর ফলে উপমহাদেশের সংকট যে নিরসন হয়েছে এ কথা বলা যায় না। সাম্প্রতিককালে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় উন্মাদনা ও জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার ফলে গোটা উপমহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক বিরাট হুমকির সম্মুখীন। এই হুমকির মোকাবিলা করতে হলে আমাদের ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হবে। আবহমানকাল থেকে এই উপমহাদেশের জনজীবনে যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সেটি সংঘাতের বা বিরোধের ধারা নয়—সেটি সমঝোতা বা সমন্বয়ের ধারা। এ সমন্বয় আমরা দেখতে পাই আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন-সঙ্গীতে, শিল্পে, সাহিত্যে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-বিচারে, ধর্ম ও সমাজচিন্তায় এবং আমাদের সামগ্রিক জীবনবোধ ও জীবনযাত্রার মধ্যে। বস্তুত এই উপমহাদেশের মানুষ আমরা যৌথভাবে এক সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আঠারো শতকে ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এই উপমহাদেশের সমাজ জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সব ধর্মের প্রতি সহনশীল মনোভাব। ইংরেজ আমলের আগে এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলতে যা বুঝি সেটা ছিল অনুপস্থিত। বস্তুত আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এই উপমহাদেশে সমাজ ও ধর্ম ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতার ধারা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদি বলা যায় যে, ১৮৫৭ সালের ব্রিটিশ বিরোধী মহাবিদ্রোহ এই ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলেই সংঘটিত হয়েছিল, তাহলে অত্যুক্তি হবে না।

উনিশ শতকের শেষের দিকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অবনতি দেখা যায় এবং যার ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ শতকে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে—এটা কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের সময়ে দেখা যায়নি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষায় :

'Hindus and Muslimes had developed friendly relations on a permanent basis as a result of the common life for centuries.' অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে একসঙ্গে বসবাস করার ফলে স্থায়ী ভিত্তিতে সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল (S. N. Sen, Eighteen Fifty Seven, for word by A. K. Azad, Page xvii)।

আজাদ আরো বলেন :

One may safely conclude that before the days of British rule, there was so such thing as the Hindu-Muslim problem in India (ঐ)। অর্থাৎ সবশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনকালের পূর্বে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না।

১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থানের সময় এদেশের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, অভূতপূর্ব দেশপ্রেম এবং বিদেশি শাসকদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা তাদের একত্র করেছিল; যদিও আধুনিক অর্থে জাতীয় চেতনার উন্মেষ তখনো ঘটেনি। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এই ঐক্য যে কতখানি দৃঢ় ছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। অতীতে মোগল আমলে মোগল-মারাঠা যুদ্ধের পেছনে ছিল প্রধানত রাজনৈতিক কারণ। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়নি। মারাঠাদের হিন্দু শক্তির প্রতিভূ এবং মোগলদের মুসলিম শক্তির প্রতিভূ—এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। মারাঠাদের অধীনে অনেক মুসলমান সৈন্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু রাজা মানসিংহ, তেমনি আঠারো শতকে বাংলার নবাব আলীবর্দীর সময় আক্রমণকারী মারাঠা সৈন্যদের অধিনায়ক ছিলেন মুসলমান মীর হাবীব। ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের সময় অতীতের মোগল বিরোধী মনোভাব ভুলে গিয়ে মারাঠা পেশোয়া নানা সাহেব দিল্লির মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। বস্তুত বাহাদুর শাহ নামে মাত্র 'সম্রাট' হলেও এবং তাঁর ক্ষমতা দিল্লির লালকিল্লার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও অতীতের পরম পরাক্রমশালী মোগল সম্রাটের বংশধর হিসেবে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ছিল অসাধারণ—'দিল্লিশ্বর বা জগদীশ্বর' সাধারণ জনগণের মধ্যে এই ধারণা তখনো তিরোহিত হয়নি।

আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা যা বুঝি তার উন্মেষ ঘটেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতের ফলে। জাতীয়বাদ হলো মূলত একটি ভূভিত্তিক চেতনা। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের আত্মপরিচয় ও ভাবমূর্তি সম্পর্কে সম্মিলিত ধারণা থেকে এর আবির্ভাব ঘটে। এই উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে দুটি

স্বতন্ত্র ধারা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, যার প্রতিভূ ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত); দ্বিতীয়টি হলো সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত)। যদিও কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ছিলেন হিন্দু, বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমানও এতে যোগ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন বদরুদ্দীন তৈয়বজী, মৌলানা মহাম্মদ আলী, হাকিম আজমল খান, ড. এম. এ. আনসারী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যরা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়ানোর বিরোধী ছিলেন এই কারণে যে, তাঁরা মনে করতেন কেবল মুসলমানদের নয়, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অধিকারগুলো একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির মাধ্যমে সংরক্ষিত করা সম্ভব।

উনিশ শতকের শেষের দিকে নানাবিধ কারণে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাগ্রত হতে শুরু করে। কালক্রমে এই মনোভাবের ফলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি উত্থাপিত হয়। এই দাবি শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ সালে স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে রূপান্তরিত হয়। যেসব ঐতিহাসিক কারণে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল সেগুলোকে এইভাবে চিহ্নিত করা যায় :

ক. উনিশ শতকে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অনগ্রসর জাতি হয়ে পড়েছিল প্রধানত এই কারণে যে, তারা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যা ছিল অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি—সে সম্পর্কে আগ্রহের চরম অভাব। পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থতা প্রভৃতি। এসব কারণে মুসলমানদের মধ্যে হীনমন্যতার মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে।

খ. অন্যদিকে হিন্দুদের মনোভাব ছিল বাস্তবমুখী ও ইতিবাচক। দীর্ঘকালের মুসলিম শাসনামলে তারা সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। এমনকি তারা মুসলিম আমলের রাজভাষা ফার্সি এবং ধর্মীয় ভাষা আরবি শিখতে দ্বিধা করেনি এবং এর ফলে অনেক হিন্দুকে মুসলিম শাসকদের অধীনে উচ্চ রাজপদে বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়। এ দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দুরা নতুন শাসকদের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেনি। তারা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করে এবং এর ফলে অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকে। তারা উৎসাহের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা শিখতে আরম্ভ করে এবং এই ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হয়। এর ফলে হিন্দু সমাজে সংস্কার ও রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণের সূচনা হয়। হিন্দু সমাজ সার্বিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

গ. উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম সমাজেও এক নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। নিছক বাস্তব কারণে মুসলমানরা বড় দেরিতে হলেও ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে অল্পদিনের মধ্যে এক নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটে; এই শ্রেণিকে অবশ্য ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিত্তবান হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে দেখা দেয় বিরোধ, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমাগত অবনতি হতে লাগল। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা যারা নিজেদের 'ভদ্রলোক' বলে মনে করত; তারা মুসলমানদের কেবল যে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল তাই নয়, তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব পোষণ করতে শুরু করল। মনীষী জর্জ বার্নাডশ' একবার বলেছিলেন, 'The worst sin one can commit towards one's fellow beings in not to hate them but to be indifferent towards them.'

বস্তুত মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের এই অদ্ভুত বিকৃত আচরণ নবজাগ্রত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের ego বা জাত্যাভিমানকে দারুণভাবে আঘাত করেছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ফলে হিন্দু সমাজে মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়। তেমনি আবার বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে হিন্দু বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ঘটে। বস্তুত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এতখানিই অবনতি ঘটেছিল যে, উনিশ শতকের শেষ দশকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত

ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা— 'The Muslim chronicle-এর ৪ জুন ১৮৯৬ সালের সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আক্ষেপ করে লেখা হয়: 'It is a pity that the two races who for hundreds and hundreds of years lived in peace and amity as children fot the same soil should learn to fallout at the fag end of the nineteenth century.' বস্তুত উনিশ শতকের শেষ পাদে ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ একটা প্রধান factor বা উপাদান হিসেবে দেখা দিয়েছিল। যদিও ১৮৮৫ সালে স্থাপিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান এর সদস্য হয়েছিলেন এটা অস্বীকার করা যায় না যে, পরবর্তীতে কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই শ্রেণির লোকেরা ছিলেন ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল এবং তারা 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে' হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলে মনে করতেন। এই ধরনের চিন্তা হিন্দু ধর্মীয় মৌলবাদের (বর্তমানে যা 'হিন্দুত্ব' নামে পরিচিত) জন্ম হয়।

বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই এই ধরনের সাম্প্রদায়িক বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। এটা ঠিক যে, উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু নেতা এই সাম্প্রদায়িক বিরোধকে পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির ওপর ভিত্তি করে মিটিয়ে ফেলার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এই ধরনের প্রচেষ্টার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন: ১. ১৯১৬ সালের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত লক্ষ্ণৌ চুক্তি; ২. স্বরাজ্য পার্টির নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ বাঙালি মুসলিম নেতাদের বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩); ৩. ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব এবং অবশেষে ৪. ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে প্রধানত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় প্রমুখ নেতাদের কর্তৃক রচিত স্বাধীন যুক্তবাংলা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

কিন্তু সব উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। বলা যেতে পারে যে, উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার অভাব এবং সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের একটা বিরাট অংশের মধ্যে চরম অযৌক্তিক, অনুদার, অগণতান্ত্রিক মনোভাব ও পরমতসহিষ্ণুতার অভাব—সব মিলিয়ে জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের সব পথ রুদ্ধ করে দিয়ে গোটা উপমহাদেশকে বিয়োগান্ত ভাঙনের দিকে ঠেলে দেয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধকে টিকিয়ে বা জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে তারা হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেছিল। পরবর্তী সময়ে তারা পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করল রক্ষণশীল মুসলমানদের যারা রাজনৈতিক সংস্কার বিরোধিতা করেছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি দ্বারা। এভাবে দেখা যায় যে, ব্রিটেনে যখন রক্ষণশীল দল টোরি (পরবর্তীকালে কনজারভেটিভ নামে পরিচিত) ক্ষমতায় থেকেছে তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতে প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। তাই আমরা দেখতে পাই, উনিশ শতকে সৈয়দ আমীর আলী, দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখ মুসলিম নেতাদের সংস্কারমূলক প্রস্তাব যেমন সেকেলে এবং আধুনিক যুগে একেবারে মূল্যহীন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনকে সমর্থন না করে ব্রিটিশ সরকার রক্ষণশীল মুসলিম নেতা নওয়াব আবদুল লতিফের পরামর্শ ও দাবি অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্থায়ীভাবে চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর ফলে গোটা মুসলমান সমাজের অগ্রগতি চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ব্রিটিশ সরকার সব সময় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছে। আবার অন্যদিকে ব্রিটেনে যখন লিবারেল বা উদারনৈতিক দল (পরে লেবার বা শ্রমিক দল) ক্ষমতায় এসেছে, তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি বেশ কিছুটা সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও তার নেতাদের প্রতি সব সময় বন্ধুত্বশীল আচরণ না করলেও অনেকটা সহনশীল মনোভাব পোষণ করে এসেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি ব্রিটিশ রক্ষণশীল জাঁদরেল নেতা উইনস্টাইন চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্ষমতায় থাকতে পারতেন তাহলে তিনি ১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবলুপ্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। তিনি নাকি দম্ভভরে তাঁর বৈশিষ্ট্যসুলভ চার্চিলীয় কায়দার ঘোষণা করেছিলেন,

"I have not become the king's first minister of preside over the liquidation at the British Empire."

Bibliography (গ্রন্থপঞ্জী)

1. রজনীকান্ত গুপ্ত, সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস, কলকাতা, 1982।
2. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, (1982-1900) কলকাতা, 1962।
3. তপোবিজয় ঘোষ, নীলবিদ্রোহ ও হরিশ্চন্দ্র, কলকাতা, 1983।
4. কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, কলকাতা, 1937।
5. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, 1368 সংস্করণ, কলকাতা।
6. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, 1957।
7. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, 1331।
8. যোগেশচন্দ্র বাগল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, শ্রী ভারতী পাবলিশার্স, কলিকাতা।
9. রতনলাল চক্রবর্তী, সিপাহিযুদ্ধে বাংলাদেশ, ঢাকা, 1984।
10. রনজিৎকুমার সমাদ্দার, বাংলা সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব, বনমালী, বিশ্বনাথ প্রকাশন, কলকাতা, 1389।
11. রমেন বর্মণ, মহাবিদ্রোহ ও বাংলা উপন্যাস, সরস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, 1387।
12. শ্যামাপ্রসাদ বসু, মহাবিদ্রোহ, বাংলা ও পাঞ্জাব, নবজাতক, কলকাতা, 1986।
13. সুকুমার মিত্র, 1857 ও বাংলাদেশ, কলকাতা, 1960।
14. স্বপন বসু, গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, 1984।
15. হায়দার আলী চৌধুরী, পলাশী যুদ্ধোত্তর আজাদী সংগ্রামের পাদপীঠ, ঢাকা, 1987।
16. Samarjit Chakrabarti, 'The Bengali Press', Calcutta Firma K.L.M., 1975.
17. Parliamentary Papers, (House of Commons), 1857-58, Vol-XL.III.
18. Benoy-Chose-Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal, (Vol-IX) Calcutta 1979.
19. Haraprasd Chattopadhyay, The Sepoy Mutiny, a Social Study and Analysis, Calcutta 1957.
20. P.C. Joshi (ed.), Rebellion 1857 : A Symposium first published 1957, Reprinted 1986.
21. R.C.Mazumder, Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, Firma K.L.M. Calcutta, 1957.
22. Ranajit Guha, An Indian Historigraphy of India : A Nineteenth Century Agenda and Implication, Calcutta 1988.
23. Nilmani Mukherjee, A Bengal Zamindar, Calcutta 1757.
24. S.N. Sen, Eighteen Fifty Seven, Delhi Publication 1957.
25. Gopal Halder, Bengali Literature before and after (1856-1857), in P.C. Joshi edited.

রবীন্দ্রনাথের গান ঃ বৈচিত্র্যের বিভায়

ড. প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গান, যা 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' নামে আজ সর্বজনে পরিচিত, একসময় সেগুলি বিশেষিত হত 'রবিবাবুর গান', 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ইত্যাদি নামে। নিজের লেখা গানগুলিকে রবীন্দ্রনাথ 'আমার গান' অথবা 'আমার আধুনিক গান' বলে নির্দেশ করতেন। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' অভিধাটি সম্ভবত সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৯—'৩০ খ্রিস্টাব্দে। শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রপরিচয়' সভায় তিনি একটি নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন, যার শীর্ষনাম ছিল 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'। এরপর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' শব্দটির প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় একটি বিজ্ঞাপনে—রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বয়স উদ্‌যাপনের জন্য আয়োজিত 'জয়ন্তী উৎসব'-এর অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থাপনায়। আরও পরে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঃ 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে দু-চারটি কথা' এবং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত কনক দাসের একটি রেকর্ড-এর বিজ্ঞাপনে কণ্ঠশিল্পীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'—এই অভিধা-প্রদান যেমন দিনেন্দ্রনাথের কীর্তি, তেমন রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর যাবতীয় গানের সংকলন যে 'গীতবিতান', তার নামকরণ বিষয়েও কবিগুরুর গানের এই কাণ্ডারীর ভূমিকাই ছিল সক্রিয়। ১৯৩০ সালের ১৬ই মার্চ রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে দিনেন্দ্রনাথকে তাঁর 'নতুন গানের বই' ছাপতে দেওয়ার খবর জানিয়েছিলেন, যেখানে ''একত্রে সব গান পুঞ্জিত হবে'' কবিগুরুর। সেইসঙ্গে এই চিঠি মারফৎ ইংল্যাণ্ডের পথে জাহাজ-যাত্রী কবি একটা নির্দেশও দিয়েছিলেন পত্রপ্রাপককে, ''তুই দেখে দিস যাতে প্রমাদ না ঘটে।'' কিছুদিন পর, ২রা এপ্রিল (১৯৩০)-এ লেখা রবীন্দ্র-সচিব সুধীরচন্দ্র করের আর একটি চিঠি পান দিনেন্দ্রনাথ এই প্রকাশিতব্য বই সম্পর্কে ঃ ''গুরুদেবের নিকট হইতে এই বই সম্বন্ধে ৪টি বিষয় জানতে চাহিয়াছিলাম ... শুধু নাম সম্বন্ধে একটু মত দিয়াছেন। নাম আপনি ঠিক করিয়া জানাইবেন।''

নিজের গানের ভাণ্ডারকে কবি মনে করতেন সর্বসাধারণের সামগ্রী। তাঁর বক্তব্য ছিল, ''আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত নাওয়ার ঘরে কিংবা এমন সব জায়গায় গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত, এর খুব বেশি ambition মনে না-ই রাখলাম।'' বক্তার আকাঙ্ক্ষার দৌড় যা-ই হোক্ না কেন, বাস্তব সত্য যে অন্য কথা বলে, সময়ই তার সাক্ষী। দিনে দিনান্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত নবতর সংস্কৃতি-চেতনার এক স্বতন্ত্র বোধের প্রকাশক হিসেবে সর্বাংশে বাংলার এবং অনেকাংশে ভারতীয় রসিক-বোদ্ধা সমাজের হৃদয়-বস্তু হয়ে উঠেছে। এই 'হয়ে ওঠার' কারণ বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ভেবেছেন,

ক. ''রবীন্দ্রনাথের গানে দেশের ও দশের প্রতি দরদ প্রাণবান জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। ... সহজ সরল ও প্রাণস্পর্শী তাঁর গানের সুর ভারতীয় সমাজের সর্বসাধারণের হৃদয়ে আসন পেতে বসতে আজ সক্ষম হয়েছে। ... রবীন্দ্রনাথের গান বাঙ্গালার মধ্যে শুধু নয়, সারাবিশ্বে এনেছে এক নূতন চেতনা। (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ)'

খ. ''... বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ নতুন যুগ এনেছেন।... রবীন্দ্রনাথ সুরে এমন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা এনেছেন যার সঙ্গীত হিসাবে মূল্য তানসেন-কৃত দরবারী কানাড়া, কিংবা মিয়াকী মল্লার অপেক্ষা কম নয়। ... এক সময় অবশ্য ছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বসাতেন। যখন থেকে দেশী সঙ্গীত, অর্থাৎ বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালের স্রোতে তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করলে কখনই তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন। ... মাটির সন্ধান পেয়েছেন বলেই রবিবাবু সঙ্গীতকে নবজীবন দিতে পেরেছেন। রবিবাবু যে সব গান লিখেছেন— সেসব একেবারেই নতুন, তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি,

যার তুলনা আমাদের দেশে অন্ততঃ নেই।" (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)[২]

স্বয়ং কবির মতে, "I do not hesitate to say that my songs have formed their place in the heart of my land, alongwith her flowers that are never exhausted, and that the folk of the future in days of joy or sorrow of festival will have to sing them."[৩]

আর এ'খানেই লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অধুনাতক লোকপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠিটি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয়, মানব-মনের সর্ববিধ উপলব্ধির এহেন সার্বিক প্রকাশ একক স্রষ্টার একত্র সন্নিবেশে আর কোথাও পাওয়া যায় না বলেই বাঙালি তার মর্মের বাণীটি সর্বার্থে খুঁজে নেয় রবীন্দ্রনাথের গানে, আর সেই জন্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আজও তার প্রয়োজনীয়তার অপরিহার্যতায় এবং প্রিয়জনতার আত্মিকতায় আমাদের কাছে সমগুরুত্বে গ্রহণীয়। ঝাঁকিদর্শনের খণ্ডিত দৃষ্টান্তে দৃষ্টিক্ষেপ করলে সহজেই একবিন্দু শিশির-কণায় ধরা দেবে সমগ্র আকাশের বিস্তার—

নবজন্মের দ্যোতনাময় প্রথম প্রত্যূষের অনুভব : 'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার...'

শিশু-মনের মুক্তলীলা : 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে...'

কৈশোরের বে-পরোয়া উচ্ছ্বাস : 'হা রে রে রে রে রে রে / তোরা ধরবি আমায় কে রে...'

উপলব্ধির যৌবন : 'যৌবন সরসী নীরে...'

প্রেমের স্পর্শ : 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি...'

প্রেমের দহন : '...তোমরা যে বল ভালবাসা ভালবাসা, সে কি কেবলি যাতনাময়...'

প্রেমিক মনের আক্ষেপ : 'ভালবেসে যদি সুখ নাহি...'

মনের বিচিত্র গতি : 'আমার মন কেমন করে...'

দেশপ্রেম, যেখানে জাতিয়তাবাদের সীমা-মুক্তি আন্তর্জাতিকতার উদারতায় : 'ও আমার দেশের মাটি... তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা...'

প্রকৃতির বিচিত্র ঐশ্বর্যের মুগ্ধতার আবেশ : 'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন...'; 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে...'; 'প্রহর সঘন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণধারা...'

মানবতাবাদী ভাব-বিশ্বাসে ক্রান্তির লক্ষ্যে : 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে...'

পরম শক্তির বিপুল বিস্তারের বিস্ময় : 'আকাশ ভরা সূর্য তারা...'

দিনান্তে মৃত্যুর ব্যঞ্জনাময় অপেক্ষার প্রহর গণনায় : 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে...' এমনই অজস্র খণ্ড অনুভবের মালায় গাঁথা এক অখণ্ড জীবনসত্য হ'ল রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডার, যার আবেদন সময়-নির্বিশেষ।

উল্লেখপঞ্জী :

১. রবীন্দ্রনাথের গান/স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, রবীন্দ্র স্মৃতি, ১ম প্রকাশ (২৫.০১.১৩৬৮), পৃ ২৩২-২৩৩।

২. রবীন্দ্রনাথের গান/ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৩০৯।

৩. The Religion of an Artist.

উত্তাল সময়, অমর মানুষ ঃ একটি ঐতিহাসিক ছবি

ড. প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)-র 'মানুষ শক্তির উৎস' (১৯৭৪) উপন্যাসের বিষয় হ'ল, ষাটের দশকের অস্থির রাজনীতি এবং নকশালপন্থীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রাণহরণের নীতিতে যুব সমাজের বিভ্রান্ত পরিণাম-চিত্র। সার্বিক উপন্যাস কাহিনির উপস্থাপন একটি অরাজনৈতিক যুবতী চরিত্র যমুনা ওরফে বিন্দুর আত্মকথনের সূত্রে। বিন্দু সকলের কাছে পরিচিত যমুনা বলে। বারো-তেরো বছর বয়স থেকে সে তার মামার কাছেই মানুষ হতে থাকে কলকাতায়। এখানকার স্কুলে ভর্তি হবার পর সে দেখেছে, তাদের মধ্যে "একদল মেয়ে আছে, ওরা রাজনীতির কথা বলে। নানান পার্টির কথা বলে। ইস্কুল স্ট্রাইকের কথা ওরা বলে....., এমনকি ইস্কুলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, ঠিক কলেজের বড় মেয়েদের মতো বক্তৃতা দেয়।" স্কুল পেরিয়ে কলেজ যাওয়ার পর যমুনা দেখে, তাদের কলেজ ইউনিয়ন আছে, ইলেকশান হয়, কিন্তু কয়েকজন ছাড়া কেউ রাজনীতি করে না। প্রথম থেকেই রাজনীতি সম্পর্কে একটা উদাসীনতার ভাব ছিল যমুনার মনে। তার এই উদাসীনতা লক্ষ্য করে স্কুলের বন্ধু রমা তাকে বলেছিল, "দেশের বর্তমান অবস্থাকে তুই মেনে নিতে পারিস? তোর মনে হয় না, এ শাসন-ব্যবস্থা বদলানো দরকার? কিছু লোক সুখ ভোগ করবে, আরামে থাকবে, আর কোটি কোটি মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে, এটা কখনো মেনে নেওয়া যায়? .....কিছু করতে হবে। আমরা চাই শ্রমিকরাজ কায়েম করতে। আমাদের দেশে শ্রমিকরা, কৃষকরা লড়ছে, আমাদেরও তাদের সঙ্গে লড়তে হবে।" রমা সবাইকে, 'নির্বাচনী সংগ্রামে' অংশগ্রহণ করতে বলে এবং মাঝে মাঝে সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও বলে।

মামার দুই পুত্র রমেন ও দীপুর সঙ্গে বিন্দুও বড় হতে থাকে কলকাতায়। মামাতো ভাইদের বন্ধুদের সঙ্গেও পরিচয় হয় যমুনার। বন্ধুদের মধ্যে বিপ্লব, শ্যামল, সুদীপ ও সজল—এই চারজন ছিল উল্লেখ্য। এরা সকলেই বামপন্থী রাজনীতি করতো, দীপুও ছিল তাদের সহযাত্রী। যমুনা দেখতো তাদের "তর্কের মধ্যে আর ছাত্র রাজনীতি থাকে না, পার্টি-নীতি নিয়েই কথা হয়। পার্টির নেতাদের নিয়ে কথা হয়। আর পার্টির নীতি এবং কৌশল। সকলের দাবী, তাদের পার্টি-নীতি এবং নেতারাই সঠিক।" ইতিমধ্যে যমুনার মামার কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়। দেখা যায়, এই বছরটায় চারিদিকেই পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন আশা আর নিরাশার জটিলতা। বামপন্থী সরকার গঠিত হয়েছে.....। বেকারের সংখ্যা ক্রম বর্ধমান। কলকারখানাগুলো বন্ধ.....।" দীপু বলে, "নতুন সরকারকে বেকায়দায় ফেলবার জন্যই কারখানার মালিকেরা চক্রান্ত করে এসব করছে।' সজলেরও তাই বিশ্বাস। একদিন সজল যমুনাকে কলেজ স্ট্রীটে হরিশদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। যমুনা শুনলো, হরিশদা বলছেন, "এ সরকার কখনো টিকতে পারে না, ভাঙলো বলে। ....একে শ্রেণীসংগ্রাম বলে না, বিপ্লবের পথও বলে না। এসব হচ্ছে মন্ত্রিত্বের পার্টি পলেটিকস্"। কলেজ স্ট্রীটে পার্টি-কর্মীদের যে জমায়েৎ কক্ষে হরিশদা এসব কথাগুলি বলেছিলেন, সে স্থানে উপস্থিত অনেকেরই হরিশদার সঙ্গে মতের মিল দেখা যায়। তাদের বলতে শোনা যায়, "বর্তমান রাজনীতি, মন্ত্রিত্ব কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারবে না। বেকারদের চাকরি দিতে পারবে না, কৃষকদের হাতে জমি তুলে দিতে পারবে না। ...এভাবে কোনো সমস্যার সমাধান করা যাবে, পার্টিও তা বিশ্বাস করে না।" ইতিমধ্যে নির্বাচন আসন্ন। হরিশদা আন্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছে। সুবীর একস্ট্রিমিস্ট হয়েছে। সজল বাইরে থেকে পার্টির কাজ করছে; তার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে, ফলে সে "যে কোনো মুহূর্তেই অ্যারেস্ট হতে পারে। জানাজানি হলে, খুনও হতে পারে। খুন এখন রাজনীতির এক মুখ্য অঙ্গ। বহু ছেলে জেলে পচছে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি, তার সঙ্গে পুলিশের খুন করা, এবং পুলিশও খুন হচ্ছে।" হরিশদা সশস্ত্র

অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সুবীরও বলে, ''মারের বদলা মার না, বহুকালের মার খেয়ে, এখন কেবল মার। প্রতিদিন নতুন নতুন শত্রু গজাচ্ছে, সবাইকে মার।"

পার্টির মূল নীতিতে সজলের কোনো অবিশ্বাস নেই, পদ্ধতি সম্পর্কেই তার মনে সন্দেহ দেখা যায়। তার মনে হয়, অনেকেই তাদের ''সংগ্রামের সুযোগ নিয়ে, নিজেদের স্বার্থে রক্তপাত করছে, অত্যন্ত নীচু স্তরের খুনী, গুণ্ডা, বদমাইস, ওয়াগন ব্রেকার্স, ছিনতাই পার্টি, এক কথায় সো-কল্ড মস্তান, আর যে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় আসার জন্য সব রকম সর্বনাশের রাস্তা ধরেছে", তারা তাদের ছায়ায় নিজেদের আড়াল করছে। তাতে দিনের পর দিন সজলদের ইমেজের ক্ষতি হচ্ছে। সুবীর কিন্তু সজলের সঙ্গে একমত হতে পারে না। সে সজলকে বলে, ''তুমি যাদের গুণ্ডা মস্তান বলছো, আমাদের ভাষায় তারা হলো লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট। তাদের বাদ দিয়ে আমাদের চলবে না। তাদের অশুভ হাতকে শুভ করে তোলার দায়িত্ব আমাদের। তাদের অস্ত্র আর ঘৃণাকে লেলিয়ে দিতে হবে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে"। সজল সুবীরকে প্রশ্ন করে, তাহলে ''সংশোধনবাদী আর দক্ষিণপন্থী অনুচরদেরও লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট বলতে হবে?" কারণ সজলের মতে, বর্তমানে ''এরা আসলে ক্ষমতাশীল পার্টিগুলোর এজেন্ট, যারা জনসাধারণের মনে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে, আর পার্লামেন্টারি মতবাদে বিশ্বাসী, বুর্জোয়া, আধাবুর্জোয়া দলগুলো তার সুযোগ নেয়।"

কিন্তু পার্টিতে ব্যক্তিগত মতামতের কোনো মূল্য নেই। পার্টি যাদের দায়িত্ব দিয়েছে, পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে নীতি আর কৌশল স্থির হয়েছে, তাই সকলকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে হয়। আর না করলেই হতে হয় দলত্যাগী। সমস্ত মানুষকে তাদের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে, না হলেই তারা শ্রেণিশত্রু রূপে চিহ্নিত হবে। সুবীরদের দাবী, তারা শ্রেণিশত্রুদের ভীত আর সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। কিন্তু সুবীরদের এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তা' সজলের উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ''রিয়্যাল ক্লাস এনিমিদের আমরা যেমন একটু গায়ে হাতও দিতে পারিনি। আমরা দক্ষিণপন্থীদের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছি, অবিশ্যিই না জেনে, পরোক্ষে, আর বামপন্থী সংশোধনবাদী পার্টিগুলোকে আমাদের সমালোচনার সুযোগ দিচ্ছি, কেননা, ওদের দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের বিপরীতে আমরাও বামপন্থী সংশোধনবাদের পথে চলেছি। কিন্তু ইনডিভিজুয়াল ছাড়া, জনতার কোনো অংশই আমাদের সঙ্গে নেই।" অথচ সজল জানে, বিশ্বাস করে, মানুষই সব থেকে বড় শক্তির উৎস!

পার্টির কার্যকলাপের সমালোচনা করার জন্য সজলকে শ্রেণিশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আর শ্রেণিশত্রুর অস্তিত্ব বিলোপ করাই পার্টির নীতি। তাই সজলকে প্রাণ হারাতে হয় হরিশদার পুত্র হিরণের হাতে।

উপন্যাস-কাহিনিতে দেখা যায়, যমুনা তার প্রেমিক সজলের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে প্রৌঢ় বামপন্থী নেতা হরিশদা, একস্ট্রিমিস্ট সুবীর, হিরণ প্রভৃতি দলীয় কর্মীদেরকে দেখেছে। তার চোখে ''সুবীরকে যেন ক্রমেই খাঁচার বন্দী বাঘের মত অস্থির" মনে হয়, সে ''হিরণের চোখে হিংস্রতা" দেখে এবং শেষ পর্যন্ত একাধিক হত্যার মধ্য দিয়ে নিহত সজলের শেষ চিঠির সত্যতা উপলব্ধি করে। যমুনার এই চরম উপলব্ধিই যেন নকশালবাড়ী আন্দোলনে মাও-ৎসে-তুঙের উদ্ধৃতি 'বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস'—এই তত্ত্বকে আক্রমণ করে লেখক কৃত উপন্যাসের নামকরণ 'মানুষ শক্তির উৎস' গভীরতর ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত হয়েছে।

আমার দুর্গা

অধ্যাপিকা ঋতা রায়
(বাংলা বিভাগ)

"হলুদ বনে বনে —
নাক ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে"—

এই সুখ না থাকার অ-সুখ সারাজীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো মেয়েটিকে—তার ছোট্ট হৃদয়টি পরিপূর্ণ ছিল সকলের জন্য ভালোবাসায়, কিন্তু তার জন্য ভালবাসার লোক বড় একটা ছিল না। দারিদ্র্য পারেনি তার অদম্য প্রাণশক্তিকে রুদ্ধ করতে—বঞ্চনা, অবহেলা, নির্মম প্রহার, গালমন্দ কোন কিছুই পারেনি তার ব্যক্তিত্বকে খাটো করতে।

'পথের পাঁচালী'র প্রথম পাঠেই তাই ছোট্ট দুর্গা তার প্রাণ চঞ্চল মুখখানি আর মমতাভরা হৃদয় নিয়ে আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে।

যতটুকু জীবন সে পেয়েছিলো তার মধ্যেই সে তার ছোট্ট ভাইটিকে নিসর্গ প্রকৃতির অন্দরে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে। কখনোই তার 'সোনার ভাঁটার' মত ভাইটির শুকনো মুখ সে সহ্য করতে পারেনি, পারেনি না ভালোবেসে সেই মা-কে যে মা তাকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে প্রায় প্রত্যেক দিন। বাবার সান্নিধ্য আদর, ভালবাসার চেয়ে বাবার উদাসীনতার সঙ্গেই পরিচিত ছিল সে বেশী — তবু বাবার প্রতি মমতা তার কম ছিল না। আর সেই অবাঞ্ছিত, অবহেলিত, সংসারের বালাই বুড়ি পিসী ইন্দির ঠাকরুণকে সে এত ভালবেসেছে যে লোকের মনে হয়েছে গত জন্মে সে বোধ হয় ইন্দির ঠাকরুণের মেয়ে ছিল।

জীবন তাকে কি দিয়েছে বলার চেয়ে জীবন তাকে কিছুই দেয়নি বলার পাল্লাটাই এত ভারি যে তার কাছে তার দুরন্ত লোভ আর সেই লোভের বশবর্তী হয়ে চুরির প্রবণতাও আমাদের কাছে তাই তুচ্ছ হয়ে যায়।

হরিহর সর্বজয়ার দারিদ্র্যের সংসারে অভাবই ছিল দুর্গার নিত্য সহচর। যদিও শিশুরা দারিদ্র্যের দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, তবুও এই দারিদ্র্যই দুর্গাকে নির্মোহ থাকতে দেয়নি কোনদিন। তাই পুঁতির মালা চুরির অপবাদের সঙ্গে অন্যের বাগানের সোনামুখী আমের গুটি চুরির অপবাদও জড়িয়ে যায়। যদিও দুর্গার ছোট্ট ভাইটি পর্যন্ত জানে আমের গুটি ঠিক চুরির পর্যায়ে পড়ে না কারণ গাছের তলায় আম পড়ে থাকলে সকলেই তার ভাগীদার হতে পারে। তাই দুর্গার এ ধরনের লোভের পেছনে আমাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের ব্যাপারটি কিন্তু থেকেই যায়। কারণ সবসময়ই আমাদের মনে হয়—কত অজস্র জিনিসের আয়োজন এই সংসারে, আর দুর্গার মত মেয়েরা তার কিছুই পায় না। সত্যিই তো, দুর্গা এত বেশী না পাওয়ার দলে (যদিও কোন আক্ষেপ, কোনও নালিশ তাকে করতে দেখা যায় নি কোনদিন) যে দুটো পাকা নোনাফল পেলেই সে খুশী। মায়ের কাছে চোরের মার খেয়েও সে কাউকে কিছু বলে নি, শুধু ভাই যখন তাকে নিবিড় মমতায় জিজ্ঞেস করেছে, 'খুব লেগেছে রে দিদি?' তখন সে বলেছে 'কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে—রক্ত বেরিয়েছিলো, এখনও কন্‌কন্ কচ্ছে'—পরক্ষণেই তা ভুলে গিয়ে পালিতদের বাগানে পরের দিন পাকা কামরাঙা পেড়ে আনার মতলব করেছে। শুধু দারিদ্র্য নয়, পিতার উদাসীনতা, মায়ের মার, পড়শীদের লাঞ্ছনা সব মিলেই দুর্গাকে করে রেখেছিলো একাকিনী। তবু তার সেই একাকিত্বের জগতে ভাইকে সে টেনে নিয়ে গেছে কারণ ছোট্ট অবুঝ ভাইটি বড় ভালো ছিল তার।

নিস্তরঙ্গ জলধারার মতোই 'পথের পাঁচালী'র কাহিনি। কিন্তু চলতে চলতে সে, জলধারায় ঈষৎ আবর্তের সৃষ্টি হয়। আশ্চর্য এই যে সে মুহূর্তগুলোর অধিকাংশই দুর্গাকে কেন্দ্র করে। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার—শুধুমাত্র দুর্গার জন্যই কিন্তু দুর্গার চরিত্র লেখা হয়নি এই উপন্যাসে, তাকে আনা হয়েছে

অপুর প্রয়োজনে। বিভূতিভূষণ নিজেই বলেছেন তিনি যখন প্রথম 'পথের পাঁচালী' লেখেন তখন তাতে শুধু অপুই ছিল, দুর্গা ছিল না। কিন্তু পরে অপুরই জন্য দুর্গাকে আনলেন লেখক। আবার অপুরই জন্য দুর্গাকে মৃত্যুর মাধ্যমে সরিয়েও ফেললেন তিনি। তবুও অপুর পাশে দুর্গার প্রবল উপস্থিতি দেখে দুর্গা ছাড়া 'পথের পাঁচালী'-কে কল্পনা করা যায় না।

জীবনে দারিদ্র্য আছে কিন্তু জীবন কোনক্রমেই দরিদ্র নয়। লেখকের এই মূল বিশ্বাস আমরা পেয়ে যাই দুর্গার মধ্য দিয়ে। দুর্গাই তো একটু একটু করে অপুকে প্রকৃতি জীবনের অপার রহস্যের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে তার সহচর করে। দুর্গা ফুল তোলে, ফল পাড়ে, ভাইকে নোলক পরায় আর বনদেবীর সাজিয়ে রাখা মিষ্টি ফলের আস্বাদেই জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চায়। যদিও আমরা জানি এই বাস্তব সংসার তাকে বঞ্চনা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। নীরেনের মত ছেলের সঙ্গে দুর্গার বিয়ের আভাস যে কল্পনার স্তরেই থেকে যাবে সেটা বুঝতে আমাদের দেরী হয় না। কিন্তু এই প্রথম দুর্গা তার খুড়িমার কথা বিশ্বাস করে নীরেনকেই স্বামীরূপে পেতে চেয়েছে। 'সুর্দশন পোকা'র কাছে তাই সে বলেছে সে যেন অপু, মা, বাবা, ওপাড়ার খুড়িমার সঙ্গে নীরেনবাবুকেও ভাল রাখে, নীরেনের সঙ্গেই যেন তার বিয়ে হয়, রাণুর দিদির বিয়ের মত বাজি, বাজনা হয়। নিজের বিয়ের কথা কল্পনা করে খুশীর একটা প্রবল ঢেউ তাকে প্রায় হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলো। যদিও তার মমতাভরা হৃদয়ের জন্য স্বার্থপরের মতো একা সুখী হতে চায়নি সে। সোনাডাঙ্গার মাঠের পরে গরুর গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়েকে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ী যেতে দেখে তার মনও ব্যথায় ভরে উঠেছে এই ভেবে যে এই বাগান, বাসকফুলের ঝাড়, রাঙা গাইটা, উঠোনের কাঁঠালীতলা, শুকনো পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ, মা, বাবা, অপু, খুড়িমা সকলকে ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরকালের জন্য! তবুও অল্প সময়ের জন্য অনুরাগের কল্পনা সে করেছিলো, নীরেনের সঙ্গেই বিয়ের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়ায় সর্বশূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মৃত্যুর পূর্বেই তার জন্য তাই আমাদের মন ব্যথায় টন্ টন্ করে ওঠে।

এত ভালবেসেছিলো দুর্গা তার গ্রামকে, তার মা, বাবা, অসহায় পিসী, তারই মত দুঃখী খুড়ীমা আর বিশেষ করে তার ছোট্ট অবুঝ ভাইটিকে যে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আসার সময় অন্য সব স্মৃতির সঙ্গে অপুর মনে পড়েছে তার দুঃখী দিদির কথা—'দিদির কত না মেটা সাধ.... দিদি যেন এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে'। পরক্ষণেই তার মনের ভাষা চোখের জলে ভিজে যেন বারবার বলতে চেয়েছে—'আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।' অপুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভুলতে পারি না দুর্গার সেই 'দুগ্‌গা-পিতিমা'র মতো সুন্দর মুখখানি, আর ভুলতে পারি না তার অসুস্থ ভাইয়ের জন্য গন্ধভেদালির পাতা খুঁজতে বনের মধ্যে গিয়ে কতকাল আগে ছেলেবেলায় পিসীমার কাছে শেখা গুন্‌গুন্ করে আওড়ানো—

"হলুদ বনে বনে
নাক ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে।"

আমরা ক্ষুদ্র তবু তুচ্ছ নই

সায়নী চক্রবর্তী
(অতিথি অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা)

এই বিশ্বজগৎ জীবনে পরিপূর্ণ, গাছপালা, পশুপাশি, হরেকপ্রাণী ও উদ্ভিদের সমাহার প্রকৃতিতে। এত কিছু দৃশ্যমানতার মধ্যে এমনকিছু জীবন আছে যারা অদৃশ্য হয়েও বিরাজমান। সেই অদৃশ্য জীবনকেই একটু দৃষ্টিগোচর করা যাক। ইতিহাসের হাত ধরে জীবনসৃষ্টির রহস্যকে খোঁজ করলে এদের সন্ধান পাওয়া যায়। জীবন তৈরীর রসায়ন শুরু হয় জল থেকে। জলে থাকা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক, অজৈবপদার্থ একত্রে তৈরী করে জীবনের প্রথম বীজ, যা কোয়াসারভেট দানা নামে পরিচিত। এরপর পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাগত পরিবর্তন নিয়ে এল একের পর এক জীবগোষ্ঠীকে। যারা অনুজীব নামে পরিচিত হল। অনুজীব পরিবারের সদস্য পাঁচ ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ছত্রাক ও শৈবাল। এরা সকলেই আনুবীক্ষনিক। শুধু নিজস্ব কিছু গুণাবলীর ভিত্তিতে এরা পরস্পরের থেকে আলাদা। গাঠনিক সরলতা থাকলেও কর্মক্ষমতার দিক থেকে যথেষ্ট পটু এরা। এদের কর্মকাণ্ড মনুষ্য জীবনে একদিকে আশীর্বাদ অপরদিকে অভিশাপস্বরূপ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন প্রকার মহামারীর সাথে এদের নাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। চিকুনগুনিয়া, বার্ডফ্লু, AIDS, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এইরকম অজস্র রোগ মানুষসহ সমগ্র প্রাণীকুলকে একরকম অসহায় করে, তুলেছে। উদ্ভিদকুলও ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা পায়নি। ভয়াবহতার দিক থেকে বিচার করলে প্রথমেই উঠে আসে ভাইরাসের নাম। এরা না জীব, না জড় হয়েও পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করে চলেছে। তবে উন্নততর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলস্বরূপ কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, ডাঃ এর্ডওয়ার জেনার, লুই পাস্তুর এই সকল বিজ্ঞানীর অক্লান্ত ও সফল পরিশ্রম এনে দিয়েছে বেঁচে থাকার রসদ। তবে তা যথেষ্ট নয়। অত্যাধিক প্রজননহার ও ক্রমাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সকল অনুজীব নিজেদের বহুরূপী করে তুলেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের চোখে ধুলো দিয়ে মারাত্মক ব্যধি সৃষ্টিতে এদের জুড়িমেলা ভার। তবুও বিজ্ঞানের হাত ধরেই মানুষ এদের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে বাঁচতে শিখেছে। অনুজীবদের কাজে লাগিয়ে তাদেরকেই মারণব্যধির হাতিয়ার রূপে কাজে লাগানো হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার তাই যুগান্তকারী। তবুও মানুষরূপী সর্বশ্রেষ্ঠ জীবকেও অনুজীবজগতের কাছে মাথা নত করতে হয় তাদের দাপুটে প্রভাবের জন্য। সবথেকে আশ্চর্যজনক হল এই অদৃশ্যমান জীবগোষ্ঠী জীবনসৃষ্টির শুরু থেকে আজও একভাবে রয়ে গেছে। পৃথিবীর মায়া এরা ত্যাগ করতে পারেনি, তাই সাধু সাবধান। এরা হয়তো বা ক্ষুদ্র তবু তুচ্ছ নয়।

'তাহাদের সাথে'

ড. শ্রীকুমার মিশ্র
(অধ্যাপক, ভূবিদ্যা)

আমরা সাধারণত আমাদের কথাই বলি; তাদের কথা বলার লোক পাওয়া যায় না; যারা বনকে তাদের আপন ঘর করে নিয়েছে; বসবাস করছে; মৃত্তিকা বসুন্ধরাকে জননীর মত করে আপনার চেষ্টায় সোনার ফসল ফলাচ্ছে; সাধারণত তাদের কথা; বলব তারাই অযোধ্যা পাহাড়ের বীরহোড় আর সাঁওতাল পরিবার।

শাল-মহুয়া-সেগুনের পাতার ছাউনীতে তাদের জীবন ধারণ ও জীবন দান; তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার কাহিনী লেখার লোক কম; চোড়িদার মুখোশ বানানোর লোকেরা যাঁরা বংশপরম্পরায় মুখোশ বানিয়ে মেলায় বিক্রি করে সামান্য উপায়ে জীবিকার সন্ধান করে তাদের কথা শোনাই কেমন—

অনিল সূত্রধর, দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের ছেলে; মুখোশের বানানোর কাজেই থাকত; ছোট-বড়-মাঝারী বিভিন্ন মুখোশগুলো বানিয়ে ছৌ-নাচের শিল্পীদের বিক্রি করে সংসার চলতো; এমনি করেই চলছিল দিনরাত; কেটে যাচ্ছে বর্ষা-গ্রীষ্ম -শীত; রমেন এসে বলল "অনিল আমরা সরকারী খরচে ছৌ নাচতে যাব; বলে, বার জনের দল গড়েছি; তুই যাবি আমাদের সাথে?"

অনিল এর মাথায় কল্পনার আলো বয়ে গেল; জীবনে দেশেই ভাল করে ঘুরে বেড়াতে পারেনি, কেমন করে বিদেশ যাবে তাই বুঝতে পারত না, বাড়ির উঠান থেকে খুব বেশী হলে লহরিয়া ধাম, নাহলে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে, শিরকাবাদ পর্যন্ত; সে আজ যাবে সাত-সমুদ্রর-তের নদী ওপারে নাচের দলের সাথে বিদেশে, সাহেবদের দেশে, যে সাহেবরা এক সময় আমাদের দেশে এসে আমাদের গ্রামের মানুষের বসবাসকেই অনিষ্টের পথে ঠেলে দিয়েছিল; তাদের দেশে আকাশ পথে না হয় জলপথে। অনিল, রঘু, কানুরা সবাই এক সাথে জড়ো হল; কথা বললো একে অন্যের সাথে; বাড়ির বুড়াবুড়িদের সাথে কথা বলে জানালো তাদের এই দূর দেশে পাড়ি জমানোর কথা; তারা নিয়ে যাবে তাদের ধর্ম-কাহিনীর সুখ দুঃখের বারমাস্যা ঐ গোরাদের দেশে; যারা এককালে আমাদের শোষণ করেছে; তবে বাড়ির বৌ-ভাইঝিদের মনে ভাবনা; অতদূরে দেশে কী হবে? কেমন করে থাকবে; কী করে কাটাবে বটে; তাই নিয়েই সবার রাত-দিন এক হয়ে যাচ্ছে। তবুও সবাই মিলে এক সাথে বসে স্থির করল যে তারা একবারই জীবনের এই মহাসাগর পথে পাড়ী জমাবে; অনিলের মনে আনন্দ ধরে না; রঘু আর কানুর চোখে কোন রকমেই ঘুম আসছে না; কখন সেই যাবার দিনটা আসবে। আমাদেই বানানো মুখোশে আমাদেরই সেলাই করা পোশাক পরে ওই গোরাদের দেশে দেখিয়ে আসব আমাদের শিল্প। আমাদের সংস্কৃতি; ওরাও জানবে যে আমরা শুধুমাত্র মুনিষ - খাটবার জন্য জন্মাইনি; চাষ করে খেতে পশু-চাষের জন্য বেঁচে নেই; আমাদের নিজ নিজ ভাষা, নিজ নিজ ভাবনা আছে; আজও যা আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে; আজ তারই সময় এসেছে; আর আজই সেই দিনগুলি কল্পনার ভাবনা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে; এ এক রঙীন আয়নায় নিজেদের দেখার সময়—

অনিল, কানু, রঘুরা বাঘমুণ্ডির চায়ের দোকানে সন্ধ্যায় বসে আলোচনা করে, কেমন করে তাদের বানানো **শিব, মা-মনসা, কালী, দুর্গা, গণেশ বাবার মুখোশ রাক্ষস-রাক্ষসীর সাজে ওদের দেশের** বড়-বড় অরকেস্ট্রা ঘরের মধ্যে ডিকবাজী দিয়ে নেচে; মাদল-ধামসার তালে তাল মিলিয়ে তাকে জরিপাড়ের পোশাক পরে সবাইকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেবে। মিনিট যায়, ঘণ্টা যায়, দিন যায়; ভাবনা আজ বাস্তবের সময় কমতে কমতে এক মুহূর্তে যাবার দিন এসে গেল; আর মাত্র তিনদিন বাদে যাবার সময়; আর মাত্র দুদিন বাকী—

অনিল, রঘু, কানু, সুবল, মোহনরা একসাথে বসে বসে ঠিক করছে বাঘমুণ্ডির বিখ্যাত ছৌ নাচের মুখোশ; যে যার দেবদেবী চরিত্রের রঙ, তাদের ভাব, তাদের মুখের কথাগুলোও মুখস্থ করে নিচ্ছে; সবার চোখে আনন্দের ঝিলিক বয়ে যায় আমাদের, দেশের শিল্প, আমাদের দেশের পুরান সংস্কৃতি, আমাদের শিল্পের মহিমা তোমরা দেখ; বিরহোড় পাড়ায় তখন আনন্দের ঢেউ; এক বেলা দু-মুঠো খেতে না পাওয়া কানুর ভাবছে তার গণেশের নাচটা কত সুন্দর করে নাচা যায়; লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে কেমন করে রঙ্গমঞ্চে হেঁটে যাবে সেই সব ভাবনায়; বাঘমুণ্ডির খাপরার ছোট ঘর অনিলের, সেই ঘরে এভাবে একে একে সফর সূচীর কাহিনী

এগোতে থাকে; আস্তে আস্তে দিনক্ষণ তৈরী হয় এবার—
"আমাদের যাত্রা হল শুরু.........."

বুধবার সকালবেলায় সকলে উঠেছে তাদের বিকেল বেলার যাবার জন্য তোড় জোড় করতে; দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল বিকেল পেরোলো, এল ছৌ নাচের রঙীন ও সুন্দর দেব-দেবীর জরির কাজ করা মুখোশ; রঙ একেবারে ঝক্ ঝক করছে তাতে হাত বোলালো অনিল, কানু, রঘু, তাদের হাতের স্পর্শে ধীরে ধীরে যেন কথা কয়ে উঠল, বেড়াবার আনন্দে; ধীরে ধীরে সেই বাঘমুণ্ডির মুখোশগুলো যেন শিল্পীদের হাতের স্পর্শে প্রাণ পেল।

মা দুর্গার মুখোশের ভাষা যেন অনিল শুনতে পায়—বলে ওঠে;—

— কি গো, তোরা আমায় বিদেশে নিয়ে যাবি; চল্; তোদের আনন্দের দিনগুলো ফিরিয়ে আনি; জীবন আনন্দে ভরে উঠুক—

— গণেশের মুখোশ; বলে উঠল আবার নতুন করে লিখি মহাভারত; কর্ণের দঃখটাও তো ভাবা হয়নি; তাই না?

কানুর — হাতে লক্ষ্মী মুখোশের দুচোখে জল, ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ে—

বলে ওঠে—আমি তোদের দুঃখ দেখতে পারি না চল্ তোদের জন্য লক্ষ্মীর সন্ধানে যাই ঐ সুদুর বিদেশে; তোদের সব সম্পদ তো ওরা নিয়ে চলে গেছে; রেখে গেছে খালি ঝাঁপি। আয় এবার তোদের ঝাঁপি ভরে যাবে; জীবনে এমন আনন্দ এই মুখোশ শিল্পীরা পায়নি; সরকারী ছাড়পত্র এসে গেল; যাবারও সময় হল; সবাই যার যার সাজ সজ্জা গুছিয়ে রঙ পোষাক সব ঠিক করে তার পরে যাবার জন্য মাদল, ধামসা, অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রগুলো গোছালো; বিদেশে অনুষ্ঠানের যাতে কোন ত্রুটি না থাকে তার ব্যবস্থা করল; যাবার সময় প্রায় প্রস্তুত গ্রামের পথে পথে রাস্তার ধারে ধারে মানুষের ভীড়; সিধু, কানু-বিরসাদের দেশের এক দল মানুষ আজ জগৎ জোড়া সুনামের অংশিদার হতে চলেছে; গ্রামের নববধুরা শাঁখ বাজিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে মুখোশ শিল্পীর মেয়েরা, মুখোশ বানানো শিল্পীরা শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন; একে একে সার বেঁধে তাদের চোখে শোখে ঝরে পড়ছে সাফল্যের আনন্দাশ্রু; বিদেশে অনুষ্ঠানের প্রথম আমন্ত্রণে আজ তারা স্বদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে পা দিচ্ছে; দেশের মাটির গড়া চারদার-রঙীন মুখোশ, রঙীন জরির মুকুট, সোনালী টিপগুলো যেন কথায় কথায় ভেসে উঠছে; ছৌ-শিল্প ও নৃত্যগুরু গম্ভীর সিং এর শুভেচ্ছা ও আর্শিবাদ নিয়ে নৃত্যদল আনন্দের সাথে সাজ-সজ্জার বোঝা নিয়ে চলল সুদুর-এর পথে পাড়ি দেবার জন্য। পলাশ-কুসুমের রঙীন জগতের হাত ছানিতে তুষার- মোড়া দেশে ছড়িয়ে দেবার নেশায় চলেছে একদল প্রত্যন্ত গ্রামীণ শিল্পী; সঙ্গে সম্বল শুধু শুভেচ্ছার ঝুলি আর রয়েছে অসীম সঙ্গী সাহস; রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের ক্রমশ বেড়ে ওঠা শব্দে দুরে চলে যায় পিছনের ফেলে আসা বাগমুণ্ডীর কুঁয়োতলার জলের বলতি পলাশ পাতায় ঢাকা ছায়া ঘেরা ছোট্ট খেতের বাগান, কফি, আলু, ক্ষেতের মায়া আর সবাকার ওপর রাঙা মাটির আঁকা বাঁকা পথ; যা চির-কাল তাদের নাচের সাথে সাথে সাজিয়ে রেখেছে জীবনের হারিয়ে যাওয়া ছন্দকে;

সাফল্যের আনন্দে যা বার বার শিরোপা দিয়েছে জীবনের ছোট্ট টানা-পড়েনের পাথেয় তে; দিন আনা দিন খাবার জীবনের মাছে মুখোশের মানুষ গুলোই একদিন সভ্যদের দেশে দেবতার অভিবাদন পায়; বিদ্যাদেবীর আর্শীবাণী ভেসে আসে সুদুর থেকে।

অনিল, কানু, রঘুদের আজ জীবন রঙীন পতাকার মত উড়তে শুরু করেছে।

বিমানবন্দর থেকে গন্তব্যের বিমান যাত্রা শুরুতেই আরোহীদের চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে; যা কল্পনায় ছিল, যা মাটিতেই স্থান পেল,

তা আজ আকাশ পথে চলল। বাঘমুণ্ডীর মুখোশ চলল বিদেশী থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য—

পরমগুরু গম্ভীর সিং-এর শুভেচ্ছা অনিল ও তার দলকে বহু সম্মানের মনি মুক্তো এনে দিল; জীবনের পিছিয়ে পড়া এই মানুষগুলোই আজ আর্ন্তজার্তিকতার সম্মানে সম্মানিত হল গ্রাম্য মুখোশ শিল্প হল আর্ন্তজার্তিক;

আকাশ থেকে আর্শীবাদের পুষ্প-পুঞ্জ খসে খসে পড়ল; অনিল, রঘু, কানুরা তাই আজ আর শুধু চড়িদার নয়, শুধু বাগমুণ্ডীর মেঠো পথের ধারে শুকনো জমির চাষী ঘরে শিল্পী নয় তারা আজ আর্ন্তজার্তিকতায় ও সার্বজনীনতায় সম্মানিত;

সম্মানিত বাগমুণ্ডীর রঙীন পলাশ ও বাগমুণ্ডীর চড়িদার শিল্পী কুল।

আজ তাই অনিলের চোখে আনন্দাশ্রু। জীবনের এই মুহূর্তে — ভীষণ খুশি রঘু আর কানু।

এরা আজ খুঁজে পেয়েছে অরণ্যের অধিকার
জীবন যাপনের স্বাভাবিক তাৎপর্য।

ভাষান্ক

শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী
(শারীরবিদ্যা বিভাগ)

সমাপন এক বন্ধা মানুষ। এক রাশ কাজ নিয়ে এক নাগাড়ে তা শেষ না করলে তার ষোল কলা পূর্ণ হয় না। শত হোক মানুষ তো! ক'দিন হল ভালো করে স্নান-খাওয়া নেই। কোনক্রমে এক মগ মাথায় ঢেলেই একমুঠো খেল কি খেল না দৌড়লো কাজ সারতে। দু'গ্রাস খা! এই ক'দিনেই এক মাথা চুল এক মুখ দাড়ি নিয়ে এক মনে কাজ করেই চলেছে। আরে বাবা, এক ছাদের তলায় যে আরও দু'টো প্রাণী বাস করে, তাদের কথাও তো একবার ভাবার!

অন্যদিকে সমাপনের এক কালের বন্ধু আলাপন যার পেটে এক কানা কড়ি বিদ্যে নেই, এ হেন মানুষ দিব্বি এক পা এক পা করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। দেখা হলেই এক মুখ হাসি। এমনিতে আলাপন কারোর সাতে পাঁচে থাকে না, তাই তার চারপাশে লোকের অভাব নেই। এক মায়ের পেটের ভাই না থাকলেও আলাপনের দু'চোখের মণি এক বোন আছে। আটপৌরে শাড়ী পরে সাত সকালে সপ্তম সুরে দাদাকে যখন আদর করে ডাকে তখন চারধারে কারোর না থাকাই ভালো। আলাপন কিন্তু তাতেই আহ্লাদে আটখানা। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটাই বোন! আসলে হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান হয় না, তাই মেনে নিতেই হয়।

আলাপনদের কাজের মেয়ে মেনকা। তার আবার তিন কুলে কেউ নেই। সেই কবেই এই বাড়িতে কাজে ঢুকেছে সে। নয়-নয় করে তার এখন তিন কুড়ি বয়স হবে। চালসে ধরেছে, হাঁটতে চলতে একটু দেরি করে ঠিকই তবে এক সময় সে এক হাতে এই সংসার টেনেছে। তখন ভাই-বোন তো এক রত্তি। মা তো শুধু দশ মাস দশ দিনই কষ্ট করেছে, বাকিটা তো মেনকার! দু'হাতে আগলেছে সব। পেয়েছে কি? অষ্টরম্ভা। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মত মেনকাকে খাটিয়ে নিয়েছে এ সংসার। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ তো আছেই, তার আত্মীয়স্বজনের আসা যাওয়া নিত্যদিন। বাড়ির কর্তার আবার বারো মেসে এক অভ্যাস। দু'বেলা নতুন করে রান্না খাবার চাই। তার তো আর দশ হাত নেই যে এক পলকে সব করে ফেলবে। সাত বাহন বকেই কি লাভ! কে শুনছে!

সমাপন আজ কাক-ভোরে উঠেছে। এক-এক করে সব দরকারী কাগজপত্র সুটকেশে ভরলো। এক ঝলক বাইরের দিকে দেখে নিয়ে আয়নায় নিজের দাড়ি ভর্তি মুখটা দেখে বাংলার পাঁচের মত করে একটু ভেঙালো। বাগানে এক ঝাঁক চড়ুই একটানা চিৎকার করে চলেছে। এরই মাঝে কাজের ছেলে বাঁছড় টেবিলে এক কাপ চা আর দু'মুঠো মুড়ি রেখে গেল। হাত বাড়িয়ে এক চুমুকে সেটা শেষ করেই এক লাফে ঘর ছেড়ে বাইরে এলো সমাপন। সাত মহলার বাড়ি না হলেও বনেদি বাড়ি, বেশ পুরানো। বনেদি বলে মনে মনে একটা অহংবোধও আছে সমাপনের ইতি মধ্যেই এক চিলতে রোদ পড়ছে উঠোনে। বাগান পেরিয়ে নাট মন্দির আছে। অষ্ট ধাতুর তন্ত্রে নয়নিমার কথা। তাকে আদর করে আসা হয়নি। মেয়ে তার কাছে সাত রাজার ধন এক মাণিক। তার বিশ্বাস এই মেয়ে এক দিন বড় হবে। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশে গিয়ে পড়াশুনো করে চোদ্দ পুরুষের মুখ উজ্জ্বল করে। হাজার হোক একটাই মেয়ে সে এই পরিবারের।

সদর দরজাটা পেরুতেই সমাপনের চোখে পড়লো ষষ্ঠীপদকে। সে বেচারা ঠাই দাঁড়িয়ে ছিলো সমাপনের অপেক্ষায়। দু'কদম এগিয়ে এসে হাত তুলে সেলাম ঠুকলো লোকটা। সমাপন জানে লোকটা একেবারে দু'নম্বরী। তাই ওকে দু'চক্ষে সহ্য করতে পারে না সমাপন। লোকটা দু'কান কাটাও। যতই অপমানিত হোক না কেন দু'পাটি দাঁত বের করে হা হা করবে। যদিও সবাই জানে লোকটা ভীষণই কষ্টে আছে। দু'বেলা দু'মুঠো জোটাতেই সারাদিন এর কাছে ওর কাছে ছুটছে। কিন্তু তা বলে

এক মুখে দু'কথা। সমাপনের সাথেই কি কম অভব্যতা করছে এক সময়! যাক্ গে, আজ কি মতলবে তা জানতে সমাপন একপল দাঁড়ালো। ষষ্ঠীপদ জানে বাবু বড়ই একগুঁয়ে লোক। তাই সাত-সতেরো বুঝিয়ে কোন লাভ নেই। এককোপে কাত না করতে পারলে মুশকিল আছে। দু'হাত তুলে নমস্কার করলো সে।

গলায় মিছরি ঢেলে বল্লো—দাদা, বিধাতার এক তরফা বিচার। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে আমার, মিথ্যা বলতে এই সাত সকালে আসিনি। বাপ-ঠাকুরদা সবই করে রেখে গিয়েছিলো। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে সব নয়-ছয় হয়ে গেলো আমার দু'চোখের সামনেই এক-এক করে! সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনিয়ে লাভ নেই, আপনি তো পাঁচ কড়িকে চেনেন? সম্পর্কে আমার দূর সম্পর্কের মামা। অকালে বাবা মারা যেতেই সেই হল আমাদের মাথা। তখন আমারই আর বয়স কত! মামা মাকে যা বোঝাই তাতেই মা ঘাড় নাড়ে। খড়িয়ার যে বড় চালের আড়ত, ওটা টো আমাদের ছিলো। ন'পড়ায় দশকর্মা ভাণ্ডার, সব বেচে দিল জলের দামে। তিনকড়ির প্রমোটারি আজ কিসের জোরে? হর বছর যে অষ্টম পহর, শত নাম কীর্তন হতো একসময় সে তো বাবার টাকাতেই হতো। অথচ আজ আমরা পথের ভিখারি। সাত পুরুষের ভিটেতে ঐ ভাঙা ঘরটি আর এক বিঘত জমিটুকু ছাড়া আজ আর কিছুই নেই দাদা। তুমি তো জানো সবই। এই পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে ষষ্ঠীপদ মুখস্ত বলে গেল।

সমাপন এতোক্ষণ তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে এবার আসল কথাটা শুনতে চাইলো। ষষ্ঠীপদ তার সমস্যা জর্জরিত কপাল আর তার চেয়ে নির্লজ্জ এক জোড়া কুতকুতে চোখ তুলে সমাপন মুখটা পরখ করলো। বুঝলো কথায় রাজি হয়েছে। বল্লো জানইতো ঐ এক মা হারা মেয়ে ছাড়া আমারও তো নিজের বলতে কেউ নেই। একটি ভালো ছেলের সন্ধান পেয়েছি, যদি চার হাত এক করে দিতে পারি তো বেঁচে যাই। তাই ক্ষমা-ঘেন্না করে যদি সাহায্যের হাত বাড়াও। কথায় বলে দশ এর লাঠি এক এর বোঝা। সমাপনের মনটা নরম হল। একশত হোক বয়স্ক মানুষ একটা। তায় এককালের স্বচ্ছল পরিবারের লোক। অভাবে স্বভাব গেছে ঠিকই। তাকে বল্লো—আগামী রোববার, একলা এসো। ষষ্ঠীপদর এই নিয়ে বারবার তিনবার হল এই বাড়িতে আসা। মনে মনে আনন্দই হচ্ছিল তার। হবে না—আসার সময় দু'শালিখ দেখেছে যে, ঘোষেদের পাঁচিলে। সমাপন ওকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এমনভাবে এগিয়ে গেল যেন দু'চোখ যেদিকে যায় গোছের। যেতে হবে তাকে সেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় নব চক্রবর্তীর বাড়ি।

এদিকে আলাপন তার এক সহকারী পাঁচুকে রেগে বলে উঠলো- হ্যাঁ রে লখাই কি সাপের পাঁচ পা দেখেছে? শোন, এক মাঘে শীত যায় না রে, আবার ঐ দু'মুখো সাপটা। আমাদের কাছেই আসবে দেখিস, যাবে কোথায়! এক গলা গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না ওর কথা। পাঁচু মাথা নিচু করে একভাবে বলেছিল অষ্টমঙ্গলার মন্দিরের ধারে। হ্যাঁ-না করলো না সে। সে জানে আলাপনকে খেপিয়ে লাভ নেই। কোন কিছু বোঝাতে গেলেই উল্টো ফল হবে। কথায় বলে একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। সত্যি বলতে কি, এক হাতে তো আর তালি বাজে না! ভুল দু'পক্ষেরই আছে। দশরথ লোকটা এক সময় আলাপনের একগ্রাসের দোস্ত ছিলো। একটু পয়সা হাতে আসতেই সাপের পাঁচ পা দেখলো যেন। এখন তো সে একটা এক নম্বরের ধান্দাবাজ। একই অঙ্গে এত রূপ খুব কম লোকেরই থাকে। যাই হোক পাঁচুর জানা নেই আজকের এই ঘটনা আবার পাঁচ-কান হবে কি না। বিষয়টা এমন হল যে এরপর আর সাতমন তেলও পুড়বে না আর রাধাও নাচবে না! শেষে ওর চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে আলাপন থামবে।

মেনকা রান্না চাপিয়েছে। পাঁচ ফোড়নের গন্ধে ম্ ম্ চারধার। শুকনো লঙ্কার ঝাঁজটা আজকাল বাড়ির কর্তা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। বাহাত্তুরে বুড়োদের এক রোগ। রান্না ভালো চাই কিন্তু কষ্ট সহ্য করবো না এতটুকু। গিন্নিমা ছিলো শতগুণে ভালো। মুখে হাসি ছাড়া কথাই নেই। মেনকা বলতে অজ্ঞান। ব্যবহারটি ছিলো যেমন মিষ্টি, দেখতেও মা লক্ষীটি। দু'চোখ জুড়িয়ে যেত। সন্ধ্যেবেলায় পঞ্চপ্রদীপ হাতে যখন তুলসী তলায় প্রণাম করতো ভক্তি ভরে তখন সে এক দেখার মত। জীবন আর কি? দু'দিন সে তো নয়। কি যে হলো তা কে জানে! ডাক্তার-বদ্দিরা এলো, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিলো। এমন সব ভাব দেখালো যেন রোগ সারানো তাদের এক হাতের খেল। কর্তাবাবু দু'হাতে খরচ করলো কিন্তু তেরাত্রি পেরুলো না। চারদিক অন্ধকার করে গিন্নিমা স্বর্গে গেল। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মেনকা একবুক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সেই থেকেই সংসারটা কেমন একপেশে হয়ে গেছে। কর্তাবাবু বসে থাকে ঘরের এককোণে। মা হারা ভাই বোন দু'টো তখন বাক্যি হারা। মেনকাই তখন তাদের দু'টো কথা বলার লোক। ধীরে ধীরে

ছেলেমেয়ে দু'টো বড় হলো মেনকার দু'চোখের উপর। আলাপন যাতে বড় মানুষ হয়, দু'টো ইংরেজী বলতে পারে, তাই কর্ত্তাবাবু তাকে মডার্ন স্কুলে ভর্ত্তি করালো। মেয়েটা তখন একরত্তি। দাদাকে স্কুলে যেতে দেখলেই সেকি একটানা কান্না! তাকে ভোলানো এক দায়। কর্ত্তাবাবু একমনে ডায়রী লেখে আর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে গিন্নিমার ফটোর দিকে। একদিন বাবুর দশটা পাঁচটার আপিসও গেল। মাথার চুল, গালের দাড়ি সাদা হয়ে গেল। ছেলের পড়াশুনো মাথায় উঠলো, ঢুকলো পয়সা কামানোর চিন্তা, বড়লোক হওয়ার ভাবনা। কবে যে তার ষোল কলা পূর্ণ হবে কে জানে। এদিকে মেনকারও তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। সব কথা মনে থাকে না আজকাল। মেনকার পর এ সংসার নয়-ছয় হয়ে যাবে একদিন।

সমাপন কাজ সেরে বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে মেয়েকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিছানায় দু'চোখের পাতা এক করলো। সাঁজবেলায় ঘুম ভেঙে দেখলো মেয়ে পাশে নেই। বাঙড়ুর সাথে বাগানে এক্কা দোক্কা খেলছে। ছেলেটা সত্যিই খুব ভালো। সাত চড়েও রা কাড়ে না। দু'বলা দু'মুঠো পেলেই মহাখুশী। ওর সততাই এক দিন ওকে দুই পায়ে দাঁড় করাবে। সততা ছাড়া এক কানাকড়িও দাম নেই মানুষের। দু'টো পয়সার জন্য মানুষ একদিন কি না করেছে কিন্তু সততা বিসর্জন দেয়নি। তাই আজ সব কেমন পাল্টে গেছে। চারদিকে অবক্ষয় আর অসততা। শেষে সবার তো সেই সাড়ে তিন হাত জায়গাই লাগবে। তা সত্ত্বেও লোভের শেষ নেই।

রাতের আকাশ দেখতে সমাপনের খুব ভালো লাগে। ছাদে উঠলো সে। চাঁদহীন আকাশে জমিয়ে বসেছে কালপুরুষ, সপ্ত ঋষির আসর। সব কিছুই এক সুরে বাঁধা। ছয় ঋতুতে আকাশও যেন আলাদা আলাদা হয়ে যায়। একটু দূরেই গঙ্গা। তাই মাঝে মধ্যেই ঠাণ্ডা বাতাস আসছে পশ্চিম দিক থেকে। একদা সপ্তডিঙি ভিড়তো এই গঙ্গার পাড়েই। ব্যবসায়ী বিত্তবানেদের ছিলো সাত মহলার অট্টালিকা জুড়ি গাড়ি, লোক লস্কর। লখনোউ, পঞ্চনদের দেশ থেকে আসতো মন্দরী বাইজির দল। বাড়ির মেয়েরা পঞ্চরত্নে সেজে সাত লহরী হিরের হার পরে চিকের পিছনে বসে সব দেখতো। সারেঙ্গী, একতারা বাজতো। চার পহর ধরে চলতো গান আর নাচ। সে সব এখন ইতিহাস। সাহেবসুবোর যুগ। জমিদারদের ছিলো সাত খুন মাপ। যা ইচ্ছে তাই করতে পারতো তারা। গরিব প্রজাদের থেকে জোর করে ষোল আনা খাজনা উসুল করার কত কায়দাই না তারা বের করেছিলো। এখন আর সেই সব বংশের তিন কুলে কেউ আছে কি না কে জানে। হয়তো সব পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। তবে এই গঙ্গার পাড়েই এখনও তন্ত্রে নয়নী ভবতারিণীর মন্দির, পঞ্চবটী ইত্যাদি স্বমহিমায় বিরাজ করছে। মেয়ের ডাক শুনে সমাপন সাত তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো। মেয়ের বায়না, তাকে এখন পঞ্চপাণ্ডবের গল্প শোনাতে হবে!

সময় দু'দণ্ড থেমে থাকে না। আলাপনের বোনের এখন চার পায়ে আলতা সে সবে সাত পাকে বাঁধা পড়েছে। কেন জানি না ছেলেটিকে মেনকা একেবারে সহ্য করতে পারে না। যেন দুই চোখের বিষ। আলাপন কিন্তু তার চার চাকা আর ছক্কা হাকানো মেজাজে বেশ আছে।

সাতসকালে বাঙড়ু সমাপনকে বললো, কে একজন দেখা করতে এসেছে। সমাপন যা সন্দেহ করেছিলো তাই। ষষ্ঠীপদ দাঁড়িয়ে আছে। আজ পয়লা, রোববার। বেশ কয়েকটা পাঁচশোর পাত্তি সমাপন তাকে দিয়ে বললো এইটা দিয়ে কাজটা চালাও। খুশিতে ডগমগ ষষ্ঠীপদ বললো দাদাগো তুমি আমায় সাত জন্মের ঋণী করে রাখলে। মনে মনে সমাপন ভাবলো একটা চারপেয়ে আপদ বিদায় হলো। আর ষষ্ঠীপদ ভাবলো আজ সমাপনের বারোটা বাজাতে পারলাম।

বাগমুণ্ডীর প্রকৃতির অধিকার

ড. শ্রীকুমার মিশ্র

উষর পুরুলিয়ার একখণ্ড জমিতে জঙ্গল, গাছ-গাছালীতে ভরা লাল মাটির জমিতে বাস বাগমুণ্ডীর এই ভূমিপুত্রদের; তারা বিরহোড়; ছোট বাগমুণ্ডীর জনপদের পাশেরই পল্লীগ্রাম, তাতে কয়েকটা বাড়ির বাস; জীবনযাপনের পদ্ধতি অত্যন্ত সাদামাটা; জীবনের চিন্তাও সেভাবে গড়ে ওঠেনি; নীচু নীচু চালানের ছোট্ট মাটির দেওয়ালের; মাটির প্রলেপ দেওয়া ঘর; নীচের দিকটা বাদামী রঙের ছোপ পড়েছে; দেওয়ালের ওপরের অংশটা সাদা রঙের প্রলেপ, ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে একটি চওড়া কালো রঙের মোটা রেখা। ঘরগুলির দেওয়ালে পরিপাটি করে লতা, পাতা, আলপনা; সুন্দর করে হাতে আঁকা, উঠোনগুলি মাটি কাদা দিয়ে সুন্দর করে নিকোনো। অনেকটা সিমেন্টের ঢালাই এর মত। নান্দনিক প্রাকৃতিক সান্নিধ্যের পরিবেশ; আমরা কয়জন প্রকৃতিপ্রেমী সকালবেলার মিষ্টি আলোয় বেরিয়ে পড়লাম ওদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে; প্রকৃতির মধ্যেই ওদের বাস; খাদ্যাভাস তেমনি, কিন্তু জীবনযাপনের আধুনিকতার ছোঁয়া আজও কোনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি।

স্বাভাবিক জীবন ভাবনা আজও একইভাবে অন্ধকারেই কালে; সরকারী অনুদানের অর্থ বরাদ্দ হয়; কিন্তু অনেক সময় হাতে এসে পৌঁছোয় না; সৌর বিদ্যুৎ সন্ধ্যার পরে রাস্তায় জ্বালানো হয়; তবু সেই আলো সবে জ্বলতে শুরু করবে। ওরা মাথাপিছু আয় বলতে কিছু বোঝে না; জঙ্গলে জীবনের বৃক্ষরাজি আর আকাশকেই তাদের মাতা ধরে জীবনযাপন চলে।

জীবনের রঙের সাথে জীবনের বাস্তব আজও তাদের মধ্যে এক হয়ে ওঠেনি; তারাই বীরহোড়। জীবন বিবর্তিত হচ্ছে শত কোটি বছর ধরে। আমরা জানি এক একটি তারকার অন্তঃস্থল থেকে সৃষ্ট পরমাণু জীবকোষগুলোর মাধ্যমে প্রাণের সৃষ্টি। পরিবেশ সচেতন প্রাণীদের সুরক্ষিত করার কাজে আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি।

এই বিশ্বে শুভ শক্তি ও অশুভ শক্তি এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থায় সমানভাবে পাশাপাশি অবস্থানে আছে।

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের Alivisen মনে করেন—"বিগ ব্যাঙ্গ তত্ত্বের নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য ছিল, কারণ উদ্দেশ্যহীন বিশ্বের কাজ কর্ম সবদিকেই অর্থহীন বলে ধরা যায়"। আমরা আজও সবকিছুতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে যুগে যুগে মানুষের বিশ্বাস প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য ও জটিলতা সৃষ্টি হল ঈশ্বরের পরম দান ধরা যায়।

এই বিশাল বিশ্বের কোন আদি অন্ত খুঁজে পাওয়াই ভার। তাই আমরা এই বিশ্বকে অন্তর থেকে দেখে বেড়াতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত।

তাই বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য আজও আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা থেকে গেছে;তাই এই বিশ্বের বিষয়ে শেষ কোন কথা বলবার সময় আজ কোথাও আসেনি।

বিখ্যাত ফরাসি জীববিজ্ঞানী জ্যাকমোনে ১৯৭০ সালে বলেছিলেন—

"এক অসম্ভব অবস্থায় অসাধারণ প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির বিজ্ঞান সম্মত আচরণে যে প্রাণের সৃষ্টি তার অনেকটাই আজও আমাদের অজানা।"

একথা সত্য যে, যে কোন এক নক্ষত্রের সহসা বিস্ফোরণে আজকের এই গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে; তা আমরা জানি বর্তমান সভ্যতার অন্যতম আধুনিকতম সংযোজন বলা যেতে পারে। আজকের দিনে যা প্রয়োজন তাহলো সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনবোধ, সংরক্ষণ ও স্বাভাবিক মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজন। আমাদের দরকার নিজ গৃহে কোন না কোন ফল বা ফুলের চারা রোপণ করে, রাস্তার পাশে ছায়াদায়ী গাছ রোপণ করে কিংবা জাতীয় প্রাকৃতিক গাছ রোপণ করে আগামী দিনের প্রকৃতিকে আরও সুন্দর ও পরিবেশ বান্ধব করে তোলা। আগেকার দিনে বাড়ির সামনের তুলসীতলার প্রচলন

ছিল, সেই তুলসীগাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে গাছে জল দেবার প্রবণতাটুকু মানুষের মধ্যে বাড়ত; কিন্তু আজকে সজীব তুলসীর জায়গায় প্লাস্টিকের নকল গাছ। সদাই সজীব যাতে জলও দিতে হয় না, তাই রুষ্ট প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিচ্ছে বার বার। পচা-শাক সবজি পরিবেশ বান্ধব হিসেবে আগেকার দিনে সজীবতার কাজ করত জৈব সারের কাজ করত। একটি গর্তের মধ্যে রাখা হত কিন্তু আর সেভাবে জৈবসারের ব্যবহার কম। কারখানায় তৈরী সার দিয়ে জমি নষ্ট করবার প্রবণতা দিনে দিনে বাড়ছে; যার থেকে আমরা আজও নিজেদের সচেতনতার মাধ্যমে বেরোতে পারছি না। আমরা ফুলের মালার সাজে সাজলেও ফুলের বাগানের সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করতে পারব না; ফুলের মালা দেবার বদলে ফুলের চারা সুন্দর টবে উপহার দিতে অভ্যেস করতে পারি। অন্তরের আবেগ নিয়ে ভাবি অথচ অধিবাসীদের আদি বাসস্থান থেকে উপড়ে এনে আমরা চাই আধুনিক জীবন যাপনের মধ্যে নিয়ে আসতে। দক্ষিণ ভারতের বিবাহিতা মহিলাদের খোঁপায় আমরা গেরুয়া রঙের, আবার ছোটনাগপুরের মহিলাদের হাতে লাল-সেগুনের ফুল দেখতে পাই; যা আমরা সাধারণত সব অঞ্চলে দেখতে পাই না। প্রান্তিক গ্রামীণ মানুষের মধ্যে, আদিবাসী মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি একটি স্বাভাবিক সচেতনতা থাকে; যা আমরা ঐ বিরহোড় গ্রামের মানুষদের মধ্যে বারে বারে দেখতে পেয়েছি। গ্রামীণ মানুষ নববর্ষের মাধ্যমে প্রকৃতি দেবীর পুজোর মাধ্যমে বৎসর স্বাভাবিকভাবেই শুরু করেন। চড়কের দিনেও আগে আগে প্রকৃতির পুজো হত; শিকার উৎসবে প্রকৃতির সাথে সেই অঞ্চলের মানুষের একরকমের মেলবন্ধন দেখা যায়। আমাদের জীবনযাপন পরিবেশ বান্ধব হবে যদি আমরাও আমাদের দেশের আদিবাসী ভাইদের 'সারহুল' উৎসবের মত প্রতি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে 'মোহবাই বা বাহা' উৎসবের মত সমস্ত গ্রামবাসী সকলে একসাথে মিলে আমোদ আহ্লাদে মিশে যেতে পারি। এই উৎসবকে আমরা সামাজিক কাজ হিসেবে নিতে পারি। তাই বিরহোড়দের মত আমরা প্রকৃতির পূজারী হয়ে প্রকৃতির যথার্থ পূজা করতে পারি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মধ্যপ্রদেশের গোন্ড উপজাতির লোকেরা প্রকৃতির পূজারী। লোধাদের বিশেষ অনুষ্ঠান 'চণ্ডীকারাম', বিরহোড়দের 'সিংবোঙ্গা', দুটোই হল সূর্য দেবতার পুজো। এস্কিমোরা উত্তাপ পায় না বলে তারা তাদের জীবনে চন্দ্র সূর্যদেরকে আপনার দেবতা বলে মনে করে। টোটো উপজাতির লোকেরা গোশালাকেই সবচেয়ে পবিত্র স্থান মনে করে; কারণ তার সাথেই সমস্ত জীবনের ভাবনাগুলো জড়িত। যদি আমরা আফ্রিকায় যাই তাহলে দেখতে পাব নুয়েরদের মধ্যে ছেলেদের ব্রতীকরণ উৎসব হয়; যা সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশেরই পূজা হয়। মণিপুর রাজ্যের 'কুকীরা' যার কাছেই সহায়তা পায় তারই পূজা করে; গারো উপজাতির মানুষেরা ধান্যদেবীর পুজো করে থাকে; জলপাইগুড়ি জেলার টোটো উপজাতি আবার প্রকৃতি দেবীর পূজারী। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুণ্ডা ও ওঁরাওরা 'সিংবোঙ্গা বা সূর্যকে তাদের প্রধান দেবতা বলে মনে করে। আবার প্রাচীন গোন্ড উপজাতির লোকেরা সাঁকোর গাছকে (টারমেনলিয়া টোমেনটাম) তাদের অন্যতম দেবতা বলে মনে করে।

আবার আমরা জানতে পারছি, আচার আচরণের মাধ্যমে ভিল জাতীর লোকেরাও হল প্রধানত প্রকৃতির পূজারী। আমাদের শারদোৎসব, নবান্ন ও শরৎ আগমনে হলকর্ষণ ও হল প্রকৃতির আপনাদের মধ্যে নিয়ে জীবনকে নিজের মত করে জানবার চেষ্টা করা। প্রকৃতিই যে আমাদের প্রধান শক্তি। তিনিই আমাদের সজীব জীবনের আকর তা আমরা আমাদের এই বাৎসরিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে করে থাকি।

আদিবাসী পরিবারের মধ্যে এই প্রভাব বেশী কারণ তাদের জীবনযাপন ও জীবন ধারণ প্রধানত প্রকৃতিকেন্দ্রিক, আমরা সেখানে নিজেদেরকে অনেকখানি দূরে নিয়ে চলে এসেছি; গাছ পোকামাকড়, ফুল ও ফলগুলিকে আমরা কেবলমাত্র দাম দিয়ে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করি মাত্র; তাদের প্রাণ তাদের আনন্দে আমরা সহজে অংশীদার হতে পারি না।

আজ ভারত তথা পৃথিবীর বৃহৎ বনাঞ্চলের অবক্ষয় কমছে; আয়তনে ছোট হচ্ছে। জীবন হচ্ছে দুর্বিসহ, ভারতের আয়তনের মাত্র ১৯ ভাগের কিছু বেশী বনভূমিতে পরিণত।

তাই প্রকৃতির জীব আমরা আজ ভীষণভাবে বিপদ-এর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আগামীতে সচেতনতা না বাড়ালে এই কোল, ভীল, বীরহোড়, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতালদের মধ্যেও প্রকৃতির রোষ নেমে আসবে সন্দেহ নেই। আসুন আমরা আগামী সবুজ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি, এক সাথে এক দেশে।

নীরবতা

অংশুমান পতি
(দ্বিতীয় বর্ষ, সাম্মানিক জীববিদ্যা)

মানুষ যা চায় তা পায়না, রাত্রি এখন ৮টা বাজে। দীঘা লোকালে বড্ড ভীড়, দুই বন্ধু সৌরভ ও অনুপ ট্রেনের জানালার পাশে বসে চা খেতে খেতে চলেছে বাড়ি। তমলুক স্টেশন ঢোকা মাত্র একটি মেয়ে উঠল ট্রেনে। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী সঙ্গে তার বাবাও ছিল। অনুপ মেয়েটিকে দেখা মাত্র খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওর সাথে আলাপ করার জন্য। কিন্তু কোথাও যেন একটা ভয় অনুপকে বাধা দিল আলাপ করতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ট্রেনটি একটু ফাঁকা হতেই মেয়েটি এবং তার বাবা এসে বসল অনুপ-এর পাশে। অনুপ মনে মনে এটি চাইলেও কোথাও যেন সে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। হঠাৎ মেয়েটির বাবা অনেকক্ষণ অনুপের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? বাড়ী কোথায়? অনুপ বলল, আমার নাম অনুপ মান্না। বাড়ি সুজালপুর। লোকটির সাথে অনুপের কথোপকথন-এর মধ্যে হঠাৎ করে ট্রেনের মধ্যে উঠে এল মুখে কালো কাপড় বাঁধা ও হাতে পিস্তল নিয়ে সোজা এগিয়ে এল দুটি ছেলে অনুপ-এর দিকে এবং পিস্তল দেখিয়ে মেয়েটির বাবার কাছ থেকে ব্যাগটি কেড়ে নিল। অবাক চোখে অনুপ চেয়ে রইল পিস্তল ধরা লোকটির দিকে এবং সে কিছু বলার আগে অনুপ লাথি মেরে পিস্তলটি তার হাত থেকে নিয়ে নিল। ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে মেয়েটির বাবাকে ফেরত দিল, লোক দুটিকে পুলিশের হাতে তুলে দিল। ট্রেনের সবাই অনুপকে সাবাস বলতে লাগল। মেয়েটির বাবা রতনবাবু হঠাৎ করে কেঁদে বললেন, বাবা আজ তুমি আমাকে বড় ঋণী করে দিলে। অনুপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তিনি বলেন মেয়েটির মা খুব জটিল রোগে আক্রান্ত, তার জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি শহরে গয়না বেচে টাকা নিয়ে ফিরছিলেন। এই টাকা চলে গেলে তিনি তার স্ত্রীকে কোনোভাবে বাঁচাতে পারতেন না। সবকিছু বুঝতে পেরে অনুপ তাদের নিয়ে দায়িত্ব সহকারে হাসপাতালে পৌছে দিল। কথায় কথায় অনুপ জানতে পারল মেয়েটির নাম অর্পিতা, মনে মনে মেয়েটিকে অনুপের খুব পছন্দ হলেও সাহস করে বলতে পারল না তার মনের কথা। ওই পরিবারের কাছে অনুপ ছিল যেন দেবদুত, দুদিন পরে অনুপ যখন ওই হাসপাতালে যায় ওদের খবর নেওয়ার জন্য জানতে পারে তারা কষ্ট করে এখানে আসাটা বেকার। লোকটি তার আগের দিন ছুটি নিয়ে চলে গেছে বাড়ি। সময় নষ্ট না করে অনুপ বেরিয়ে পড়ল খোঁজে, হঠাৎই এক সন্ধ্যায় অর্পিতার সাথে তার দেখা এবং দীর্ঘ কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারল মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়েছে, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে অনুপ ফিরে এল বাড়ি ঠিকই কিন্তু কোথাও যেন একটি ক্ষীণ কষ্ট রয়ে গেল মনের মধ্যে।

দু-এক কথায় কলেজ বেলা

বিশ্বজিৎ মাইতি
(প্রাক্তন ছাত্র ২০০৩, বাংলা বিভাগ)

সালটা ২০০০। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি। শরীর জুড়ে আনন্দের মায়াজাল। এবার কলেজে ভর্তি হবার পালা। সময়ের সাথে জাবর কেটে ভর্তি হলাম আনন্দমোহন কলেজে, বাংলা সাম্মানিক বিভাগে। কলেজ শুরু হয় পড়ন্ত সূর্যের আলোয়, বিকালের আঙিনায়। শুরু হল আমার জীবনে, শিক্ষার জন্য নতুন পথ চলা। সৃষ্টি হল ছাত্র জীবনে সম্পর্কের খেলাঘর। শিক্ষকদের সাথে আমার। আমার সাথে বন্ধুদের। একান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কলেজের প্রাকারের সাথে। শুরু হল নতুন লড়াই। বড় হতে হবে। কিছু করতে হবে। ভালো মানুষ হতে হবে। সময়ের সিঁড়িতে পায়ে পা দিয়ে এগিয়ে চলল আমার শিক্ষা। কলেজের তিনতলার শেষ প্রান্তে আমাদের বাংলা ক্লাস হত। হয়তো বা এখনও হয়। প্রথম দিনের কলেজের স্বাদ অন্যরকম, আলাদা অন্য এক ভুবনে। সে ভুবনের রাজপুত্র আমি। পথ চলতে চলতে প্রবেশ করলাম বাংলা বিভাগের ক্লাস রুমে। প্রথমদিন পরিচয় হল আকবরের সাথে। বসে আছে একা। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কী বাংলা অনার্সের ছাত্র? উত্তর হ্যাঁ। বেশ ভালো লাগলো। এভাবে তৈরি হল একের পর এক বন্ধু। ঢেউ উঠল গভীর বন্ধুত্বের, সকলের সাথে। মনের আঙিনায় জায়গা নিল—কৌস্তভ, গোপাল, চুমকি, রাজর্ষি, মারুফ, স্নেহা, সোমা, অনুপ, অতনু, তাপস, গুরু, সাখা, অলোক, প্রসেনজিৎ, দেবাশিষ আরো অনেকে। যাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ল না, তবে তারাও আমার মনের আরশিতে আছে। দেখা হলে চিনতে পারবো। চেনাটাই স্বাভাবিক। আর না চেনাটা অলৌকিক। পৃথিবীর বাস্তব আর না-বাস্তবের মাঝে বেঁচে থাকে সম্পর্ক। যে সম্পর্ক হল শিক্ষাগুরু আর ছাত্রের। এ সম্পর্ক চিরন্তন, শাশ্বত। এ সম্পর্ক মাটি আর চারার। এ সম্পর্ক লিখে শেষ করা যায় না। এ শুধুমাত্র অনুভূতি ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি বলেই লালন-পালন করে পাওয়া যায় সুখ আর শান্তি।

আমার ছাত্র জীবনে লেখা-পড়া-স্বপ্ন গড়ার কারিগর হলেন সোহারাব হোসেন। একথা অস্বীকার করার সাহস নেই। প্রথম ভালোবাসা। সে আজ পনেরো বছর আগেকার কথা। ইতিহাসের পাতায় ইতিহাস সৃষ্টি করে মানব। তাই আজ কিছু কথা বলার সুযোগ পেলাম। কিছু কিছু লেখার...।

চলতে থাকলো একের পর এক ক্লাস। কখনও দর্শনের, কখনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের। আবার কখনও বাংলা অনার্সের পাশাপাশি ঐচ্ছিক বিষয়। আমাদের সময় কলেজে পার্টওয়ান আর পার্টটু ছিল। প্রথম বর্ষে কোন পরীক্ষা ছিল না। শেষ দু'বছর পরীক্ষা দিতে হতো। তাই প্রথম বর্ষ বেশ আনন্দ, মজার সাথে কেটে গেল। সময় বাতাসের বেগে বয়ে চলল, আমরাও গা ভাসিয়ে দিলাম সমান তালে। ভাব সমুদ্রে পরিচয় হল স্যার-ম্যাডামদের সাথে। আমাদের সময় বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন অমিতবাবু (নাট্যকার অজিতকুমার ঘোষের পুত্র অমিতকুমার ঘোষ)। সেই সূত্র ধরেই, আমরা নোঙর বাঁধলাম—প্রশান্ত স্যার, সোহারাব স্যার, অসিত স্যার, ঋতা ম্যাডাম, ব্রততী ম্যাডাম, অয়ন্তিকা ম্যাডাম, ঋতবরী ম্যাডাম, লাইব্রেরিয়ান ম্যাডাম, রাজুদা, সুকুমারদা প্রমুখদের সাথে। ভেসে চলল আমাদের নোঙর। মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দিলাম আমরা সবাই। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য মধ্য আকাশে ফিকফিক করে হেসে চলেছে। শীত বাতাসের পাখিরা গুনগুন করে চলেছে আমাদের মন পাখির সাথে। আমরাও সুর তুলেছি একতারায়। কেউবা মাঝি, কেউবা বাউল হয়।

আমার বিষয় বাংলা হলেও, আমি দর্শন পড়তে বেশ ভালোবাসতাম। কিন্তু বিষয়ের ভিতরকার বেশ কিছু অংশ আমার মাথায় ঢুকতো না। তাই বারবার দর্শনের ম্যাডামকে (ঋতবরী ম্যাডাম) ব্যস্ত করতাম। শুধু ম্যাডাম নয়, বন্ধু সোমাকেও। আমি উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করি, যার ফলে

অন্য বিষয়গুলো একটু সমস্যা সৃষ্টি করত। পরে সব ঠিক হয়ে যায়। দর্শন বিষয়ে আমি বেশ ভালো নম্বর পাই। আমি আনন্দ পাই, ম্যাডামও বেশ পান। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বেশি পাইনি। ম্যাডাম চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো আমি ফাঁকি দিয়েছিলাম। এতো গেল পার্শ্ব বিষয়ের ইতিকথা। এবার ফেরা যাক আমার বাংলা বিষয়ে। যাকে ঘিরে আমার বেঁচে থাকার জগৎ। আমার মাটি। আমার কবিতা। আমার লড়াই।

বাংলা পড়তে ভালো লাগত। কিন্তু লিখতে পারতাম না, সঠিক বাক্য। সব সময় বড় বড় বাক্য। যার মধ্যে পূর্ণ অর্থ থাকতো না। কেবল বড় নিঃশ্বাসের বাক্য। পূর্ণচ্ছেদ বলে কিছু থাকতো না। স্যার-ম্যাডামরা এটা ঠিক করার কথা বললেন আমায়। শুরুতে বেশ ধাক্কা খেলাম। একাধিক বানান ভুল। বাক্য ভুল। ভুলে ভুল। সব ভুল। ভাবতে শুরু করলাম আমার আর হবে না। আর হবে না আমার দ্বারা। এখানেই ইতি টানতে হবে আমায়। বাংলা পড়া হবে না। একটা বাক্য সঠিক লিখতে পারি না, সে আবার বাংলা সাম্মানিক পড়বে! এ যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। সত্যি তাই। শেষ পর্যন্ত স্যার-ম্যাডাম মিলে, আমায় পথ দেখালেন। শুধু লেখা নয়, পড়াশোনার প্রতি যত্ন নিতে শেখালেন। ক্লাসের প্রতি, বন্ধুদের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা বাড়লো। স্যার-ম্যাডামরা সময় পেলে, সুযোগ পেলে আমাদের ক্লাস নিতেন আলাদাভাবে। কখনও লাইব্রেরিতে বসে, কখনও বা স্টাফ রুমে বসে। আমরা সবাই মন দিয়ে ক্লাস করতাম। আমাদের সময় বাংলা নিয়ে চৌত্রিশ জন ভর্তি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত হাতে গোনা কুড়ি জনকে পাই। অল্প শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমাদের পড়ার আসর বেশ জমে উঠেছিল। ব্রততী ম্যাডাম-ছিন্নপত্র, সোহারাব স্যার-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, উপন্যাসের পাঠ, অয়ন্তিকা ম্যাডাম-নাটক, ঋতা ম্যাডাম- চোখের বালি উপন্যাস, প্রশান্ত স্যার- ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়ক পড়া নিয়ে বেশ মেতেছিলাম আমরা। একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল বসার রুমে। আমরা সবাই বসে আছি সোহারাব স্যারের ক্লাসের জন্য। আমাদের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি পড়াবেন। পড়ানোও শুরু হয়। এমন সময় স্যার কৌস্তভকে বলেন—তুমি উপন্যাসটা পড়েছো। উত্তর এলো হ্যাঁ। তাহলে বলো-উপন্যাসের শুরুতে কি আছে? কৌস্তভ উত্তর দিল-স্যার মনে নেই। তাহলে বলো-উপন্যাসের শেষে কি আছে? উত্তর এলো-মনে নেই। কৌস্তভ, তুমি তা হলে উপন্যাসটা ভালো করে একবার পড়ে নিও। কৌস্তভের পাঠ শেষ হতে না হতে অলোক বলে—স্যার আমি আজকে, গল্পকার, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শবদেহ দেখে এলাম পি.জি. হাসপাতালে। সোহারাব বাবু বললেন তুমি জানো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কে? উত্তর এলো-হ্যাঁ, স্যার দেখে এলাম এই সবে। সেদিন আর আমাদের পড়ান নি স্যার। সে এক হাসির দিন ছিল। এভাবেই স্যার-ম্যাডামদের সাথে দুষ্টুমি করে আমাদের ক্লাস চলতো।

বেঁচে থাকার তাগিদে শুরু হল লড়াই। এ লড়াই অস্ত্রের নয়। এ লড়াই মন আর মেধার। একের পর এক পরীক্ষা দেওয়া। কলেজ টেস্টের খাতা দেখাবার সময় স্যার, ম্যাডামরা আমাদের ভুল ধরিয়ে দিতেন। বিশেষ করে সোহারাব স্যার, অয়ন্তিকা ম্যাডাম আমার হাতের লেখা, বানানের দিকে জোর দিতে বলেন। আমার হাতের লেখা প্যাঁচানো টাইপ ছিল। সঠিকভাবে বর্ণ বোঝা যেত না। সোহারাব স্যার হাতের লেখায় প্যাঁচানো ব্যাপারটা ঠিক করতে বলেন বারবার। হাতের লেখার পাশাপাশি বলতেন যুক্তি দিয়ে উত্তর লিখবি, তাতে উত্তর সঠিক হবে। নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস বাড়বে। চেষ্টা করেছি। ফল পেয়েছি অক্ষরে অক্ষরে। কলেজে থাকাকালীন আনন্দ যেমন পেয়েছি, সেই রূপ দুঃখও পেয়েছি। হয়তো বা সেটা প্রেমের ক্ষেত্রেও হতে পারে কিংবা স্যারের বকার পরিমণ্ডল হতে পারে। দুঃখ তো জীবনের অঙ্গ। দুঃখ না থাকলে আনন্দ কোথায়। জীবন তা হলে অসার। জীবন অসহায়। দুঃখ ছিল বলে পড়াশোনা ভালো করে করেছি। বন্ধুদের সাথে মজার দিন কাটিয়েছি। ফাঁকা হলঘরে বসে আড্ডা দিয়েছি। কবিতার আসর বসিয়েছি। চিৎকার করেছি। গানও করেছি। সে সময়ের জীবনটা ছিল ঠিক যেন আবোল-তাবোলের দেশ। এক রূপকথার মেজাজ। সেখানের রাজা আমরাই। আমাদের কথা শেষ কথা। আমাদের পদধ্বনিতে কলেজের বাংলা বিভাগ গমগম করছে। চারিদিকে আলো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এক রাশ শিক্ষার্থী। কেউ ফাঁকা ক্লাস রুমে একা। কেউবা স্যারের ক্লাস শোনায় মগ্ন। এ এক অন্য জীবন। অন্য ভুবন। অন্য স্বাদ। অন্য রঙ। এ জীবন কারোর কাছে পরাজিত নয়। এ যেন এক মাটির টানে বড় হওয়া। ভুল আর ঠিকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক একটা মাটির ঢেলা। শিল্পীদের মতো রূপ দিচ্ছেন আমাদের স্যার-ম্যাডামরা। আমার খুব মনে পড়ে গোপালের কথা। বয়সে আমাদের থেকে অনেক বড়। চেহারায় আমাদের মতো সামান্য আকারে। খুব শান্ত, ধীর। খুব গরীব। সকালবেলা মজুরের কাজ করত, রাতে কলেজে আসতো। কথা কম বলতো। খুব ভালো মনের মানুষ ছিল। আমরা মজা করতাম ওর সাথে

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সোহারাববাবু বলতেন—তোরা জানিস ও কত বড় তোদের থেকে? সব বুঝতাম। তবু মজা করতাম। স্যার-ম্যাডাম ওকে নিয়ে (পড়াশোনা) অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফসল ফলেনি। শূন্য খেত শূন্য রয়ে যায়। সেকেণ্ড ইয়ারে বেশ কয়েকটা নতুন মুখের সমাগম ঘটে। হাবভাব বিশাল ছিল। কথা কম বলতো। অন্য কলেজ থেকে আসা। তাদের গতি যেন আমাদের থেকে দ্বিগুণ। সে এক চোরাবালি। সে বিষয়ে না বলাই ভালো। বিতর্ক সৃষ্টি হবে। বেশি কথা অল্প করে বলা ভালো। তাতে সৃষ্টি কর্তা রাগ করবে কম। সময়ের সাথে প্রবেশ করলাম থার্ড ইয়ারে। শুধু অনার্সের চারটি পেপার। সেকেণ্ড ইয়ারে পাশের পেপার, অনার্সের প্রথম চার৷০ পেপারের সাথে হয়ে যেত। রেহাই পেলাম বেশি পড়ার থেকে। কোথায় রেহাই? এতো কম সময়ে সমুদ্র দেখার মতো চারটি পেপার ঘাড়ে এসে পড়ল। ভালো নম্বর পেতেই হবে। সবার মধ্যে আগ্রহ প্রবল। সবাই ব্যস্ত। সবাই ক্লাস করার জন্য তাকিয়ে থাকতাম স্যার ম্যাডামদের দিকে। অল্প সময়ে বিশাল সিলেবাস শেষ করার তাগিদ সবার মধ্যে। আমরা ফাঁকি দিতাম কম। রেগুলার ক্লাস করতাম—কৌস্তভ, সোমা, রাজর্ষি, চুমকি, অলোক আর আমি। পড়ার চাপের মধ্যেও কবিতা নিয়ে আড্ডা বসতাম লাইব্রেরিতে, বসার রুমে সোহারাব স্যারের সাথে। প্রবীর ভালো লিখতো। প্রবীর মণ্ডল পুরো নাম। এখন সে কবি। কবি হবার যোগ্য প্রতিভা ওর মধ্যে ছিল। প্রবীর আর কৌস্তভের সৎ সঙ্গে আমার লেখা শুরু। কৌস্তভের বাবা ভালো কবিতা লেখেন। নিজের লেখা একটি কবিতার বই দিয়ে বলেন, ভালোভাবে কবিতা চর্চা করবে আর মা-বাবাকে দেখবে। শুরু হল আমার কবিতা লেখার চর্চা। আমার লেখা শুনতেন সোহারাব স্যার আর অসিত স্যার। অসিত স্যার বাংলা বিভাগের নয়। তিনি বাণিজ্য বিভাগে পড়ান। লেখার সূত্রে ওনার সাথে প্রথম পরিচয়। খুব মজার মানুষ। আজ আছি কাল নেই। তবে যাত্রাপথ স্থির ছিল আমাদের। লড়াই করতে হবে যে। মেধা আর নম্বরের সাথে। থার্ড ইয়ারে সময় কম বলে আমরা সাজেশন ভিত্তিক পড়াশোনা করি। শুধু নম্বর পাবার জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে যে। দিন-রাত এক করে দিলাম। শুধু পড়া। স্যার-ম্যাডামদের সহযোগিতা নেওয়া। নোট দেওয়া। নোট ফোটোকপি করা। যে যার মতো প্রস্তুতি নিই। পরীক্ষাও দিই। বেশ কিছু সাজেশান মিলে যায়। সময় মতো ফল প্রকাশিত হয়। সারা কলেজ জুড়ে আনন্দ। হই-হল্লাড়। চিৎকার, পাশে কান্নাও থেকে যায়। সে সব আজ ইতিহাস। পুরাতন কিছু কথা স্মৃতির পাঁজরে শব্দ করে যায়। শব্দ করে বলেই আজও কলেজে আসি। আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র বলে গর্ব অনুভব করি। এই কলেজে না এলে আমি অসম্পূর্ণ থেকে যেতাম। স্যার-ম্যাডামদের এতো স্নেহ, ভালোবাসা পেতাম না।

আজ ২০১৫ সাল। অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলাম জীবনের সাথে লড়াই করতে করতে। জীবনকে নতুন করে দেখার জন্য আরোও লড়াই করতে হবে। এতো সবে শুরু মাত্র। এই পথ চরৈবেতি, চরৈবেতি। আমি সকলের ভালোবাসা, আর্শীবাদে ভালো আছি। এখন শিক্ষকতা করি। আমার কর্মের জায়গাও সুন্দর করার প্রয়াস নিয়েছি। সুন্দরের কোন শেষ নেই। প্রয়াসেরও শেষ নেই। আমি এই পথের পথিক মাত্র। আমার অনেক বন্ধু বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। সবাই ভালো থাকুক। ভালো থাকাটাই জীবন। কোথাও ভুল হলে ক্ষমা করে দেবেন। কলেজে আসি বলে, অনেক নতুন ছাত্র-ছাত্রীর কথা জানতে পারি। বেশ ভালো লাগে। করিম, রাকেশ, তনুশ্রী এরা কলেজের নতুন মুখ। এদের হাত ধরেই আমার-আমাদের কলেজ বেলা। ব্রততী ম্যাডাম যদি কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য লেখা না চাইতেন, তাহলে হয়তো আমার এ লেখাটা সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। এর জন্য ম্যাডামকে প্রণাম।

স্মৃতির ডায়েরীতে

অরিন্দম পাল

সকাল হারানোর স্মৃতি নিয়ে বসেছে দুপুরের খাতা। সকালের স্মৃতি বড়ো মধুর। সকালের প্রথম আলো ফোটা দেখেই প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত। ফুল তার রূপ দেখিয়ে মুগ্ধ করে পৃথিবীকে। যত দিন যায় সূর্যের তেজ বাড়তে শুরু করে ফুল তার মুগ্ধতা হারিয়ে তেজহীন হয়ে পড়ে, পেশাদারিত্বের জ্বালায় ফলে পরিণত হয়। সকালের প্রথম আলোয় শিশির কিছু ঝলমল করে। দিনের আলোয় সে আবার হারিয়ে যায়। আমরা প্রত্যেক মানুষ এভাবে সকালের প্রথম আলোয় ঝলমল করি। তারপর দিনের আলোয় ফুলের মত পেশাদারিত্ব দেখিয়ে বাণিজ্যিকভাবে সফল ফলে পরিণত হয় না হয় শিশির বিন্দুর মত হারিয়ে যায়। কিন্তু দিনের শেষে ছুটিতে, সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার অবসন্নতায়, পড়ন্ত বিকেলের আবির খেলায় দিন শুরুর কথা মনে পড়ে। সবার মনে পড়ে কিনা জানি না কিন্তু আমার যে মনে পড়ে সেটা স্বাভাবিক।

তখন আমি ছয় সাত বছরের। সকাল শুরু হত পড়া দিয়ে। সকাল থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়া ছিল চূড়ান্ত নিষিদ্ধ। নটার সময় খবরের কাগজ দিয়ে যেত বাড়িতে, আর সেটাই ছিল বাইরে বেড়িয়ে যাবার দরজা। আমরা স্কুলে যেতাম স্কুল শুরু হবার প্রায় ঘন্টা দেড়েক আগে। প্রচুর তাড়াহুড়ো থাকত তবুও স্নান আর খাবার মধ্যে। সাড়ে নটার মধ্যে সবকিছু সেরে নিয়ে হাজির শিকুদের বটতলায়। আর সেটা ছিল আমাদের অপেক্ষার জায়গা। তারপর একদল ছেলে মিলে স্কুলে যাওয়া। যদিও অপেক্ষার থেকে বড়ো ছিল বটতলায় গায়ে একটা কুল গাছ আর তার পাশে নাম না জানা একটা গাছ। সেই গাছটা ছিল সবচেয়ে আগ্রহজনক। শহরে গ্রামোফোন টাইপের একটা হলুদ ফুল। সেই ফুলটা তুলে তার বোঁটাটা ছিঁড়ে মুখে করে টানলে খুব সুন্দর একটা গন্ধ পাওয়া যেত। সেটা খাবার জন্য সবাই খুব আগে বটতলায় আসার চেষ্টা করতাম। কুল যথেষ্ট ছিল তাই ওটার প্রতি আগ্রহ খুব কম জনেরই ছিল।

আমার ছিল প্রবল ক্রিকেটের নেশা। এত অল্প বয়সে এত নেশা আর দুজনের ছিল। আমরা তিনটে দলে ভাগ হয়ে যেতাম ভারতের খেলা থাকলে। "স্যার পায়খানা যাব" "মাঠে পায়খানা আমার পোষাত না" যা যা তাড়াতাড়ি যা। 'স্যার আমিও যাব' আর একজন বলল। এই বলে স্কুলের পিছন অবধি তাড়াতাড়ি করে হাঁটা। এরপর ছুট। মাঠের আল ধরে শীতকালে আর আর সরষে ফুলের মাঠ ধরে খেলার মাঠ পার হয়ে গ্রামের পিছন দিয়ে নালার এক হাঁটু জল পার হয়ে একটা কাকাদের বাড়ি। শুধু খেলার ফল দেখে আবার দে ছুট। একবার ধরা পড়ে গেলাম সেহবাগের সেঞ্চুরীর জন্য। 97 নট আউট। এখান থেকে ফিরব না। সেঞ্চুরী দেখেই যাব'। বলে বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে এসে স্যার জিজ্ঞাসা করতে সত্যি বলে দিলাম। মিথ্যা তখনও বলতে শিখিনি। পরে পৃথিবীটা শিখিয়ে দিল। ছোটো মাস্টারও খেলা খুব ভালবাসত। তাই কিছু তো বলল না। উপরন্তু খেলা হলেই আমরা গিয়ে মাঝে মাঝে result দেখে আসতাম। আর দু-এক ওভার বোনাস। সবটাই অনুমতিসহ। তবে এর জন্য বাড়ি থেকে পড়ে আসতে হত।

আমাদের বড়ো মাঠ থাকলেও আমরা খেলতাম একটা খামার বাড়িতে। একদিন বাড়িতে বল ঢুকে গিয়ে খাবার বাটিতে চলে গিয়েছিল বলে খেলা বন্ধ। দুদিন খেলতে দিল না।

ছোট মাস্টার মশাই না এলে সেটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। বড়ো মাস্টার মশাই বেশ গল্প বলতেন। মার ধোর কম করতেন। ছোট মাস্টার যতক্ষণ থাকতেন শুধু পড়িয়ে পড়িয়ে যেতেন। শীতকালে যখন খুব ঠাণ্ডা পড়ত আমরা ঘরে না বসে বাইরে মাঠে বসতাম। রাস্তা দিয়ে কটা লোক আসছে, কে আসছে, কার মুখ কেমন, কার কথা বলার ধরণ কেমন সব অনুসরণ ও অনুকরণ আমাদের প্রিয় বিষয়গুলোর একটা ছিল। আমাদের একটা বিষয়ে অনুমতি ছিল। ব্রাহ্মণ মনসা পুজো সেরে বাড়ি ফিরলে আমরা ঝাঁক হয়ে গিয়ে প্রণাম করতাম। "তোমাদের মনঃকামনা পূর্ণ হোক" বললেই সবাই মিলে গোলমাল করে "আমি হেলিকপ্টার চাপব।" দু একজন এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে বলে উঠত "আমি হেলিকপ্টার কিনব"। দুএকজন দমিয়ে দিয়ে বলত "অনেক দাম, জানিস?" তারা অবসন্ন মুখ নিয়ে আর বাকিরা হেলিকপ্টার চাপার প্রবল আনন্দে যে যার জায়গায় গিয়ে বসতাম। চুলে খামচিয়ে দেওয়া, শ্লেট ভাঙা, পেন্সিল চুরি, স্যারের নজরের আড়ালে চিমটি কাটা এসব তো ছিলই।

শীতকালে আমরা মাঠে বসলে বড়ো মাস্টার মশাই নানা গল্প বলতো। তার মধ্যে অন্যতম আমাদের স্কুলের পাশে চাষের জমির থেকে একটু দূরে ছেলেপোঁতা পার। ওখানে বাচ্চারা মরে গেলে পুঁতে দিয়ে আসে। আমাদের একটা দাদার ছোট বোনকে ওখানেই পুঁতে দিয়ে এসেছে। তার থেকেও ভয়ানক ওরা রাতে কাঁদে, এগাছ-ওগাছ লাফালাফি করে, পাশ দিয়ে কেউ গেলে ঘাড় মটকে দেয়। ''ভালো করে না পড়লে ওখানে দিয়ে আসব"। বড়োমাস্টারের এই কথা শুনে তোড়জোড় করে পড়াশুনো শুরু। সেবার শীতেই আর একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটল। গ্রামের কালু বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের স্কুল ডাঙার তালগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরল। ভোর দুপুরে। স্কুল ছুটি ছিল। আমরা শুনে ছুটে দেখতে গেলাম। যদিও মা অনেকবার বারণ করেছিল। তবুও কে কার কথা শোনে। গিয়ে দেখি কালুর নিথর দেহ উত্তরে হিমেল হাওয়ায় তালগাছের উপরে দুলছে। আর আর মা গাছতলায় বসে ''ওরে কালু রে, কী করলি রে" বলে চিৎকার করছে। এই দেখে কালুর থেকে বেশি নিথর হয়ে গিয়েছি আমরা চার পাঁচ জন ছেলে। এমনি শীত তারপর এই দৃশ্য দেখে আমরা তো আরও কাঁপছি। স্কুল খোলার মাস খানেক অবধি আমরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কোন একজন মাস্টার মশাই এলে তার পিছন পিছন স্কুল ঢুকতাম আর তালগাছের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমি তো রাতে ছাদে উঠলে শুধু যে মাকে নিয়ে যেতাম তাই নয় মায়ের একটা হাত ধরে থাকতাম। হাত ছেড়ে দিলেই মাকে খেঁকিয়ে উঠতাম। এরপর কাছ থেকে বাবা, দিদি, ঠাকুমার মৃত্যু দেখলাম। জীবন শিখিয়ে দিল সব ভয়ই বৃথা, সময়ের চোখরাঙানি।

আমার যখন ছয় বছর বয়স তখন দিদি হাইস্কুল যাবার জন্য সাইকেল চালানো শিখছিল। একদিন একটা পুরানো ভিটে বাড়ির কাছে এসে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। আমরা অর্থাৎ আমি, একটা দাদা আর আমার বয়স্ক একটা খুড়তুতো বোন। আমরা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করার জন্য দিদির সঙ্গ ছেড়েছিলাম। এসে দেখি সবাই তাড়াহুড়ো করে মাটির বড়ো বড়ো চাঁইগুলো তুলছে আর তার নীচে দিদি। শেষ অবস্থায় কাতরাচ্ছে। সবাই খুব কাঁদছিল। বিকেলে দিদির মুখে, কানে, নাকে তুলো গুঁজে দিদিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। আমি অপেক্ষায় ছিলাম দিদি পরের দিন ফিরে আসবে। পরের দিন সবাই ফিরে এল। জেঠু, কাকা পাড়ার সবাই। আমি তখনও দিদির জন্য অপেক্ষায়। আর ফিরে আসবার কেউ ছিল না। ছোটদিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "দিদি কই"। (ছোটদি অর্থাৎ বড় জেঠুর ছোট মেয়ে।) দিদি আসবে না"। "আমরা তো আছি, দিদি আর ফিরবার নয়"। বাস্তবটা পরের দিনও বাচ্চা আমিকে বিশ্বাস করাতে পারিনি। শুনেছিলাম মরলে ভূত হয়। তাই অনেক অপেক্ষা করেছি রাতের ছাদে। মেয়েরা এরকমই। এলে বোঝা যায় না গেলে বোঝা যায়। আজও আফশোস হয়, দুঃখ হয়। মনে হয় বড়ো হলে এর মত হত, ওর মত হত। মনে হয় না এরকম নয়। কিছুতেই বড়ো হওয়া মুখটা আনতে পারি না। কাবুলিওয়ালার মত আবার ভুল করে বসি মিনিকে শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা বলে।

বাস্তবটা বড়ো হয়ে বুঝতে শিখেছি বা পৃথিবী শিখিয়েছে। আমরা যখন ছোট বেলায় অন্যের খামারবাড়িতে খেলতাম তখন তারা প্রত্যেকদিন গাল দিত। চু কিতকিত খেলবার সময় লোকের বাড়ির মড়াইয়ের এদিক-ওদিক করতাম, অন্যের বাড়ির বারান্দায় এদিক ওদিক করতাম, তখন বকত গাল দিত। আজ অনেক দিন পর যখন খেলা শেষে সন্ধ্যেয় সবাই বাড়ি ফিরে গেছি যখন Selfish giant-এর বাগানে শুধু শীত তখন Selfish giant বসন্তের কথা ভাবে। ওই খামার বাড়িতে আর কেউ যায় না। নতুন জমানায় বাচ্চাদের খুব অভিমান একবার বকলে ঐদিকে আর নয়। আর আমরা দিনের পর দিন বকা খেয়ে গেছি আর এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করেছি। ঐ খামারে আবার গেলে তারাই বলে "তোরা বেশ কত ভাল ছিলিস, বিকেল ভর জায়গাটা গমগম করত। এখন আর কেউ আসে না। বিকেলটা যেন কাটতেই চাই না"। ভাবি বিকেলটা কেটে গেছে, সন্ধ্যায় পরের দিনের জন্য সবাই পড়তে ব্যস্ত। আজ চোখ বন্ধ করে, লাইট অফ করে ছোটবেলার কথা ভাবলেই শুধু দুষ্টুমি মনে পড়ে। স্কুলের সামনে ফুলগাছ লাগানো, নির্মল অভিযান সহজে মনে পড়ে না। ছোটোবেলার বিষয়গুলো কেটে গেছে, স্কুল ডাঙার মাঠে আর কালুর কথা ভেবে ভয় করে না, রাতের ছাদে মাকেও অনাবশ্যকভাবে ডেকে আনি না। বাস্তবকে মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। তবু মনে এমন রূঢ় বাস্তব যেন বারবার না আসে। আর সেই খামারের ঠাকুমাকে বলি সেদিন তুমিও জানতে না বিকেলগুলো আর আসবে না, আমরাও জানতাম না বিকেলগুলো এত মধুর ছিল। জানলে সূর্যকে থামিয়ে দিতাম। পড়বার জন্য আর সন্ধ্যেও হত না।

শাশ্বত গাথা

তনুশ্রী নস্কর
(সাম্মানিক বাংলা, তৃতীয় বর্ষ)

সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। আজ শুক্রবার। মেদিনীপুর যেতে হবে। কামাই করা চলে না। শনি-রবিবার তানা আর অনন্যাকে নিয়ম করে স্যারের সাথে যেতে হয় ওখানকারই একটা N. G. O.-র স্কুলে ওরা ট্রেনি টিচার। স্যার হাতে ধরে ওদেরকে শেখান Special child -দের deal করার কৌশল। এটা স্যারের দাক্ষিণ্যও বলা চলে। স্যার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ওদের কাছে। তানারা শুক্রবার বিকেলে রওনা দেয়, রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসে। ঠিক পৌনে পাঁচটায় তানা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাল। স্যার পৌঁছেছেন ওর কিছুক্ষণ আগেই। অনন্যা আসেনি এখনো। অনন্যাকে ফোন করা হল।

কোথায় তুই?

ও কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—এই শোন না, প্লিজ কিচ্ছু মনে করিস না। আমি যেতে পারব না।

একি! কেন? সকালে বলিস নি তো!

আরে, তখন কি জানতাম না কি! এইমাত্র মা ফোন করে বলল SBI এর পরীক্ষা পরশু। তার Admit Card এসে গেছে। পরীক্ষাটা তো দিতে হবে, বল! তুই স্যারকে একটু বুঝিয়ে বলিস প্লিজ!

ব্যাস হয়ে গেল। ও আমতা আমতা করে স্যারকে পুরোটা বলল। স্যারের মুখটা একটু থমথমে হয়ে গেল, দু' একটা ঝাঁঝালো কথাও শোনা হ'ল। এখন ওদের ট্রেনটা হাওড়া স্টেশন-এ ইন করছে।

স্যার ট্রেন দিয়েছে, চলুন।

তুমি কি যাবে? স্যার ইতস্তত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

সে কি! আমি কেন যাবো না? তানার গলায় বিস্ময়।

না মানে....., বাড়িতে জানিয়ে একবার দেখো! একা আমার সাথে যাবে, ব্যাপারটা সবাই ভালোভাবে নেবে না।

তানা বুঝতে পারল সেই চিরাচরিত ব্যাধির পোকা স্যারকে ছিদ্র করছে।

ওকে স্যার! ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না তো! চলুন।

তানা। তুমি আর একবার ভেবে দেখো।

স্যারের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। আর তানায় একুশ চলছে। কিন্তু ভাবনার আছেটা কি তানা বুঝতে পারছি না। যে মানুষটার সাথে ওরা মাস পাঁচেক এভাবেই Continuous যাতায়াত করে আসছে, মিশছে, চলাফেরা করছে বিগত বছর দুয়েক ধরে যাঁর এতটুকু ত্রুটিও ওদের চোখে পড়েনি। বরং ও বাড়িতে গল্প করেছে। মাসতুতো দাদাটিও হয়ত কখনো এইটা সম্মান বা যত্নের ধার ধারে না। তাঁর সাথে মাত্র দুটো দিন বা রাতের জন্য যাবে তাতে ভাবনার আছেটা কি! কিন্তু স্যারের এরকম দৃঢ় কথায় ও একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল—'আপনার কী সমস্যা হবে স্যার?'

না তানা, আমার সমস্যা নয়। কিন্তু তোমার বাবা-মা তো এটাই জানবেন যে তোমরা দুজনই যাচ্ছ। আর এই ব্যাপারটা জানলে তাঁরা এটাকে সহজ করে নাও নিতে পারেন।

আপনি কী আমার মতামত চাইছেন স্যার? তানা কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা আনল।

স্যার বললেন, শান্ত হয়ে, হ্যাঁ চাইছি।

তাহলে বলি, আমি বা অনন্যা দুজনেই আপনাকে খুব বিশ্বাস করি, সম্মান করি। আমি খুব বিবেচনা করেই বলছি, আমি যেতে প্রস্তুত। অবশ্য তাতে যদি আপনার সমস্যা না থাকে।

ট্রেন এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। অ্যানাউনস্‌মেন্ট হয়ে গেছে। চলো-স্যার বললেন। টাটা-স্টিল এক্সপ্রেসটায় ওদের বাঁধা-ধরা সিট এই দিনটাতে। A. C.-র পর চার নম্বর কম্পার্টমেন্টটাতেই

ওরা বরাবর যায়। এই কামরার বাকি যাত্রীদের একটাই গ্রুপ। এই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা গ্রুপটার সাথে ওদের ভালো পরিচয় হয়ে গেছে। আড়াই ঘন্টার পথটা ওদের সাথে গল্প গুজবে কেটে যায়। তানা, অনন্যা আর স্যারের জন্য একটা সিট বরাদ্দ থাকে। ওরা সিট পেয়ে গেল।

ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। তানা কানে কর্ড লাগিয়ে গান শুনছে। এই বৃষ্টি ভেজা পায়ে। সামনে এলে হায়!/ ফোটে কামিনী। তানা আড়চোখে একবার স্যারকে দেখে। স্যার মন দিয়ে পেপার পড়ছেন। বিশ্বকাপের খবর। অনেকক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করে কামরার শব্দও কিছুটা থিতিয়ে এসেছে। খড়গপুর এসে গেছে। কামরায় চায়ের বৌদি উঠেছে। আবার সবাই হই হই করে উঠল।

স্যার চা খাবেন না!

ও হ্যাঁ! স্যার যেন বড়ো বেশি অন্যরকম। স্যার চা খেলেন, দাম মেটালেন, কিন্তু অন্যদিনের মতো বললেন না তো, তানা, বিস্কুট বার করো। তানা নিজেই বিস্কুট বার করে নিল। তানার গান ভালো লাগছে না আর। এ কী রে বাবা! স্যার কি আর তার সাথে কথা বলবেন না নাকি! এমনিতেই সে একটু বেশি হাসিখুশি, কথা বলা মেয়ে। স্যারের সাথে যাতায়াত করতে করতে এই যুবা বয়স্ক শিক্ষকটি ওদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। তবে কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যাননি। হ্যাঁ, ওরা মাত্রা ছাড়িয়েছে। স্যারকে বিয়ে করার জন্য পাত্রী খুঁজে দিতে চেয়েছে। স্যার এইসব প্রিয় অথচ দুষ্টু ছাত্রীদের বকা দিয়েও প্রচণ্ড শাসন করেন না (একটু সিরিয়াস বলেই)। আর তাতেই ওরা প্রশ্রয় পেয়েছে!

তানা ভাবতে চেষ্টা করছে ও কি কিছু ভুল বলে ফেলেছে স্যারকে। না, মনে হয়! তবে কী ও এসে ভুল করল! কিন্তু অতখানি রাস্তা বাড়ি থেকে উজিয়ে এসে আবার ফিরে যাবে কি! বাবা-মাকে ও ঠিক ম্যানেজ করে ফেলবে। তাছাড়া ও তো কোনো অন্যায় করছে না! ও তো স্যারের সাথে গায়ে পড়েই কথা বলতে গেল। এ কী! স্যার তখন থেকে একটাই খবরে কী মুক্তো খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

নামা হল যথারীতি। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। ছাতায় মানছে না। ওরা প্রায় ভিজে ভিজে এসে অটোতে উঠল। চলো 'গীতাঞ্জলি' লজ। যাত্রী কম, চারজন। স্যার এখনও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। আচ্ছা, স্যার কী কোনো অপরাধ বোধে ভুগছেন একা একটা অবিবাহিতা যুবতীকে সঙ্গে এনে!

দাঁড়াও, দাঁড়াও.....। অটো ব্রেক কষে দাঁড়াল। স্যার ভাড়া মেটাচ্ছেন। বিল্ডিং এর সামনে বড়ো বড়ো করে লেখা 'গীতাঞ্জলি'। পাশে কবিগুরুর মুখাবয়ব।

কাউন্টারে এসেই ও যা শুনলো তাতে ওর অবস্থা তথৈবচ। ওরা যে দুটো রুম ভাড়া নেয় 9 আর 10, তার মধ্যে একটা বুক করা হয়েই আছে, আর, আর একটাও খালি নেই। সর্বনাশ! এবার কী হবে! স্যারের মুখ সাদা। কিন্তু তানা খুব জোরে হেসে উঠল। হাসিমুখ দেখে স্যার খুব অবাক হয়ে গেলেন। ওনার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলল, স্যার আজ তো দুজন। আর রুমে তো দুটো সিঙ্গল খাট আছে। তাহলে আর চিন্তার কী আছে?"

কাউন্টারের বোসবাবুর ওদের কথায় মন নেই। তিনি বাইরে বৃষ্টি দেখছেন।

না তানা, চলো অন্য লজে যাই।

সে কী! কেন?

তুমি! তুমি আমার সাথে একটা রুম শেয়ার করতে পারবে?

তাতে কী! দুটো তো খাট!

তুমি কী এখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না?

বুঝতে তানা সবই পারছে। কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্স গ্রাজুয়েট এই মেয়েটার কাছে ব্যাপারটা ধীরে ধীরে ঘৃণার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। বিশেষত স্যারের সাথে এই জাতীয় কথাবার্তা ওর একেবারেই ভালো লাগছে না।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। পরের লজটা আরও মিনিট কুড়ির পথ।

ও আবার খুব সিরিয়াস হয়ে বলল, আমার কোনো অসুবিধা হবে না স্যার! বলে নিজেই চাবিটা নিয়ে সিড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। রুম খুললো একাই। আলো পাখা চালিয়ে খাটের উপর বসতে গিয়েও বসল না। পুরোপুরি ভিজে গেছে ও। ব্যাগ খুলে সব বার করছিল। নাইটি, তোয়ালে, ইনার গারমেন্টস। এগুলোকে আবার তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলতে হবে। এটাচ্ বাথরুমের হাতলে ওগুলোকে রেখে রেখে জুতো খুলে একপাশে রাখল। জিনিসপত্র সব খাটের উপর উজাড় করে ঢেলে পাখার তলায় ব্যাগটাকে ঝুলিয়ে দিল। চটের সাইড ব্যাগ, ভিজেছে ভালোই।

দরজায় টোকা পড়ল। কে? 'আমি' স্যারের মৃদু গলা। 'হ্যাঁ স্যার খুলছি'। দরজা খুলে দিয়েই ও বাথরুমে ঢুকে পড়ল। আয়নায় দেখল নিজেকে। মেয়েরা ভিজলে না কি সেক্সি হয়ে ওঠে। নমুনাটা ওর ঠিক চোখে লাগল না। দুর ছাই! ও শাওয়ার খুলে দিল।

বেরিয়ে দেখল, স্যার বিরস মুখে তখনও বসে আছেন। আচ্ছা, যত হেজিটেশন কী স্যারের। তানা তো মেয়ে। লজ্জা তো ওর হওয়ার কথা। ওরই যখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না তখন স্যারের কী।

স্যার, রাতের খাবারটার কী হবে?

ও, এই তো যাচ্ছি। ওরা নীলিমা হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট থেকে লাঞ্চ বা দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারে।

আপনি ভিজে জামাকাপড়ে এতক্ষণ বসেছিলেন কেন?

ও, ও কিছু হবে না।

কিন্তু হল। রাতের নিরামিষ প্লেট খেতে খেতে ওই জোর করে স্যারের সাথে কথা বলছিল। কাল ক্লাসে কী হবে? আপনার অসুস্থ কাকিমা কেমন আছেন? অপারেশনে কত খরচ পড়ল? ইত্যাদি বকতে বকতেই খাওয়া শেষ হলো। স্যার কিন্তু সহজ হতে পারলেন না। এতগুলো ছাত্রছাত্রীকে ক্লাস নেবার সময় যে দাপটের সঙ্গে পড়া বোঝান বা বকাঝকা করেন, গল্প করেন, একজন ছাত্রীকে একা পেয়ে তাঁর সেই সাহস কর্পূরের মতো উবে গেছে। টিপিকাল বাঙালি স্যার আমাদের। ভাবল তানা। আর ভাবতেই ওর পেটের মধ্যে হাসির বুদবুদগুলো চরে বেড়াতে লাগল।

খাওয়ার পর অন্যদিন ওরা লুডো খেলে।

স্যার, লুডো খেলবেন তো? তানা জিজ্ঞাসা করল।

'না, ইচ্ছে করছে না! তারপর কী ভেবে আবার বললেন—ও হ্যাঁ, পাতো বোর্ড'। খেলা চলছে। কিন্তু মন নেই। না স্যারের, না ছাত্রীর। তানাও বোধহয় এবার ভাবনার জগতে চলে যাচ্ছে। আবহমানকালের চিন্তা, সংস্কার, তাই! না কি অন্য কিছু! কেন তবে ওর শরীরে আনন্দ জাগছে, শিহরণ! রক্ত ছলাক করে তলপেটে ঢেউ দিয়ে যাচ্ছে! হাসি অনর্গল ঠোঁটের পাশ থেকে মুক্ত হচ্ছে! আর স্যারের অনুভূতি কী হচ্ছে? ওনারও কী রক্ত ছলকাচ্ছে না কী সংস্কার-বিবেক কোনো পাপবোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে! নাকি উনি ভয় পাচ্ছেন। এরকম বৃষ্টিমুখর রাত। যে রাতে পুরুষের আগ্রাসন ইচ্ছা যে কোনো মুহূর্তে চিতাবাঘ হয়ে ঝাঁপ দিতে পারে, সেই চিন্তাকে তিনি কন্ট্রোল করতে না পারেন!

খেলা জমল না। ওরা শুয়ে পড়ল। একা নাইট ল্যাম্পটাই মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। তানা পাশ ফিরে শুয়ে চাদর টানল। দেখল, ওর অনুচ্ছিষ্ট দেহে খিদের কোনো লক্ষণই নেই। দারুন ওয়েদারে হেড ফোনে গান শুনতে শুনতে কখন যেন ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল কীসের শব্দে। তানা উঠে বসল সচকিতে, বোঝার চেষ্টা করল কীসের শব্দ। পাশের খাটে স্যার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। ও ছুটে গেল অন্ধকারেই। কী হয়েছে স্যার? তানা বেড সুইচ অন করল। স্যার চোখ খুললেন। চোখ লাল। তাতে কামনা নয়, প্রবল যন্ত্রণার চিহ্ন। ও স্যারের মাথায় হাত রাখল। কপাল প্রবল গরম। বুঝল, অতটা সময় জলে ভিজে জ্বর এসেছে। ও ভেবেছিল ওরই আসবে, এল স্যারের। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক আর জল এনে আবার তাঁর কপালে হাত রাখল। স্যার, ওষুধটা খেয়ে নিন। খুব কষ্ট করে স্যার উঠে বসলেন। ওর হাত থেকে ওষুধ নিয়ে খেলেন। তানা স্যারকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। স্যার শীত করছে? স্যার হ্যাঁ বললেন। সে নিজের চাদরটা ওনার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে এল। পাখাটা অফ করে দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্যার ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়ে পড়লে ও নিজের খাটে এসে একটা ওড়না গায়ে টেনে শুয়ে পড়ল।

তানা দেরিতে ঘুম ভেঙে ওঠে। সুব্রতবাবু ঘুম ভেঙে মাথায় গায়ে সামান্য ব্যথা অনুভব করলেন। যাক। একটা রাত কাটল। তানার খাটে চোখ গেল। নাইটি উঠে গেছে হাঁটুর উপরে। ওড়নার উপরেই শুয়ে তানা। মেয়েটাকে ভোরের আলোর মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। তিনি আস্তে আস্তে ওর বেড কভারটা ওর গায়ে ঢেকে দিলেন। আরামে তানা সেটা ঘুমের ঘোরেই টেনে নিল। প্রাতঃকৃত্য সেভিং সেরে খাটে এসে যখন বসলেন তখনো তানা ঘুমাচ্ছে। সুব্রতবাবু ভাবলেন, তানা এখনকার মেয়ে, অপরিণতমনস্ক। কিন্তু এটা তাঁর কলেজে বা তানার বাড়িতে জানাজানি হলে ব্যাপারটা ভালো হয়ে দাঁড়াবে না। তাছাড়া তানার বিবাহিত জীবনেও এটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আসলে তানার জেদটাই তিনি মেনে নিলেন। তবে জানে না কেউ, জানার মধ্যে অনন্যা। ও-কি এটা প্রচার করবে! সুব্রতবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে পড়ল, কাল রাতে তানা ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এমন হঠাৎ জ্বরে কাহিল হয়ে পড়লেন তিনি। খুব কাছে এসে গিয়েছিল তানা। তাঁর ভাবতে লজ্জা করছে! জ্বরের ঘোরে তিনি ওর শরীরের সুগন্ধ পেয়েছিলেন। ঘোরেই সুখ পাচ্ছিলেন যেন। সে কীসের সুখ! সে কী তানার সারল্যময় হস্তস্পর্শ সেবার, না কি-অবচেতনে তিনি নারী সুখ পাচ্ছিলেন! ছিঃ! তাঁর মনে হচ্ছে একটা ভীষণ অনুচিত কাজ করে ফেলেছেন। এখনো শরীরে লেগে আছে তানার হাতের পরশ! যৌবনের একটা পথ হেঁটেও পিচ্ছিল যৌনতায় কখনো হড়কে যাননি তিনি।

আদর্শের বুলি না কপচেও তিনি মনে-প্রাণে নারীকে সম্মান করেন। তানাকেও। আচ্ছা, তানার মনে কি এটা একবারও খারাপ কলুষ বলে মনে হচ্ছে না!

'স্যার, শরীর কেমন আছে?' উঠলেন আধুনিকা।

ভালো আছি। তুমি না থাকলে রাত্রে যে কী হত!

আপনিই তো আমাকে নিয়ে আসতে চাইছিলেন না। তানা মনে মনে বলল। ওর মুখে দুষ্টু হাসি।

স্নান করে ওরা স্কুলে রওনা দিল। আজ যেন অনেকটা সহজ হয়ে গেছেন স্যার। ক্লাসের বাচ্চারা স্যারের প্রাণ। এইসব মানসিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন বাচ্চা পড়ানো খুব একটা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এই একটা কাজই স্যারের ধর্ম, কর্ম, ধ্যান-জ্ঞান, বিশ্রাম আর ভালোবাসা।

আর একটা সন্ধ্যা এসেছে। দুটো খাট জোড়া লাগিয়ে লুডো খেলছে তানা আর সুব্রতবাবু। ফোনে নরম সুরে গান বেজে চলেছে। আজ খুব মন খেলায়। তানার ফোনে রিং হচ্ছে। অনন্যা।

হ্যাঁ বল!

কী রে কেমন আছিস?

ভালো রে।

আর স্যার?

স্যারের কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল। এখন ভালো আছেন। চকিতে স্যারের মুখে চোখ বোলাল তানা।

খুব সেবা করলি?

'কী বাজে বকছিস? কাছে ওষুধ ছিল খাইয়ে দিলাম।' অনন্যা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল ওপারে। আর কিছু করিসনি তো!

তুই রাখ, পরে কথা হবে।

'দেখিস, বিয়ের আগেই সব সেরে ফেলিস না!' তানা ফোন কেটে দিল।

মাত্র দু হাতের ব্যবধানে স্যার বসে আছেন। ফোন স্পিকারে না থাকা সত্ত্বেও সব কথাই যে ওঁর কানে গিয়েছে তানা ভালোই বুঝল। স্যার ঝুঁকে বসে আছেন। ওর মাথাটাও কেমন লজ্জায় নিচু হয়ে যাচ্ছে। স্যার যে ওর কাছাকাছি বসে আছেন সেটা অনন্যার জানার কথা নয়। এগুলো ওদের মধ্যে টুকিটাকি চলে। কিন্তু এ অবস্থায় তো চলে না।

কী করবে ওরা! জোর করে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করবে! মাথা নিচু করে লুডো খেলা চলছে আবার। একটু অসাবধান হলেই কেটে যেতে পারে খুঁটি। মাথা নিচু হয়ে যেতে পারে লুডো ছক্কার জগতে।

আবার ফোনটা বাজছে। তানা কেঁপে উঠল। স্যার, কে ফোন করেছে? স্যার ভরকণ্ঠে বলে উঠলেন। —'মা!'

মা কে বোলেনা যে অনন্যা আসেনি। স্যার বলবার আগে থেকেই যেন ও জানত একথা বলতে নেই।

'হ্যাঁ মা বলো'। টুকিটাকি কথা বলার পর শেষ হল। মা যদিও অনন্যার কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। তানা মেনে থাকেনি কখনো। তাই বাইরে গেলে মা কিছুক্ষণ পরপরই ফোন করে। কাল ট্রেনে বসেও সে মাকে অনন্যার অনুপস্থিতির কথা জানায়নি। কিন্তু কেন এই লুকোচুরি? সমাজ মানে না তাই। নেহার কথাগুলো — হলেও কেন এই মুহূর্তে ওদের চামড়া কালাকালা করে দিল! কে ভয় দেখাচ্ছে এত! কে সজোরে ঢেলে দিচ্ছে বুকের ভিতরকার প্রাণ পাখিটাকে। আর খেলতে পারল না তানা। মা যদি বলত, অনন্যাকে ফোনটা দে, সে দিতে পারত না। মা যদি জানতে পারে সে স্যারের (অর্থাৎ পরপুরুষের) সাথে দুরাত কাটিয়ে ফিরছে তবে কী মা তাকে খারাপ ভাববে! তবে কি সে ভুল করল? না কি সত্যিই কোনো অপরাধ করেছে! কিন্তু এই কাজ অপরাধ কী করে হয়! কোন ব্যাখ্যায় হয়! স্যার তো তাকে স্পর্শও করেননি। সেও তো নিস্কুলুষ। তাহলে কীসের ভয় লাগছে! ঝলকের যাবতীয় সাহস আজ তার উড়ে গেছে। তানা ঝুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। স্যার চমকে তাকালেন ওর দিকে। কিছু বলতে পারলেন না। স্যার তাঁর পথ হারিয়ে ফেলেছেন একরাত্রিতে এক পরনারীকে সাথে এনে, স্পর্শ ছাড়া রাত যাপন করে।

আমরা কোনো ভুল করিনি তানা। তবে এভাবে আসাটা উচিত হয়নি।

তানারা পাপ করেনি। পাপ কী তা আমরা ভালো বুঝি না। পাপ মানে কী দেহ মিলন! যা ছাড়া আমাদের বীজবপন সম্ভব হত না। নাকি পাপ বিয়ের আগে দেহ মিলন! হয়ত দ্বিতীয়টা। বিয়ে হল সেফটি। যদিও ব্যাপারটা একই। মানুষ মিলনকালে পোশাকের সাথে সাথে মানুষটিকেও সরিয়ে রাখে। তখন সে যৌন ক্ষুধাতুর পশু। কিন্তু এটা যে ও দুটোর কোনোটাই নয়। তবে কি পরপুরুষের সাথে (তিনি স্যার হলেও) এক ..... কাজে যাওয়াটাও পাপ! তানা কাঁদছে। স্যার ওর মাথায় হাত রেখেছেন। কিন্তু স্যারও যে কাঁপছেন। ধুলোয় মিশে যাচ্ছে তাঁর সম্মান। আর কোনো কালেই হয়ত তিনি তানার কাছে স্বাভাবিক হতে পারবেন না।

রাতের খাবার পড়ে রইল। খিদে নেই, অনিচ্ছে ততোধিক। ওরা শুয়ে পড়ল। কারোর মুখে আর কথা নেই। যেন কতকালের

অতল লজ্জা আর সঙ্কোচ ঠাঁই গেড়েছে ওদের মাঝে। দুপাশে ফিরে দুজনে দুটি আলাদা সিঙ্গল খাটে। ঘুম আসছে না আর। অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করতে হচ্ছে। ঘুম আসছে না কেন তানা! তানা নিজেকে প্রশ্ন করে। তুমি কী উচ্ছিষ্ট হয়েছো তানা? না, না কখনো না। তবে ভিজছ কেন এভাবে! তানা ভিজছে, সত্যিই ভিজছে, অনন্তকালের আদিম নারীসুখস্নান। এভাবে, এইভাবে! কাল রাতে ও স্যারের মাথায় হাত রেখেছিল, তালুতে পেয়েছিল পুরুষ উষ্ণতা। বলো তানা! সত্যিকারে বলো! কী ইচ্ছে করছিল তোমার! পেতে ইচ্ছে করেনি, একান্ত আপন পুরুষটির মতো ওনাকে পেতে। ছিঃ তানা ছিঃ। শরীর জাগেনি নাগীন হয়ে! আর আজ! মাত্র চারহাতের ব্যবধানে স্যার। অচিন পাখিটির মতো। বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে প্রচণ্ড। তুমি পাপ করছো তানা! অভিশাপের মতো প্রস্রবিত হয়ে চলেছে তোমার নারীসত্তা।

রাতটা কোনোক্রমে কাটল। পরদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পালা। আজ তাড়াতাড়ি উঠেছে তানা। স্যারও উঠে পড়েছেন। ওরা রেডি। তানা বেরোচ্ছে, পিছনে স্যার।

'তানা শোনো'। স্যার পিছু ডাকলেন। ও ফিরে দাঁড়াল। স্যার ওর হাত ধরে ফেললেন। 'এই দুটো দিনকে ভুলে যেও আর.....। আর কখনো একথা কাউকে প্রকাশ কোরো না'।

তানা ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে ফেলল। স্যারও হাত ছেড়ে দিলেন।

ওরা নামতে লাগল।

হাওড়া থেকে বাসে ফিরছে তানা। স্যার চলে গেছেন। তানার ব্যাগ ভারী লাগছে যেন। বাসটায় খুব ভীড় হয়ে গেল। এই মিনিবাসগুলোর লেডিস সিট আলাদা নেই। পাশে বসা ভদ্রমহিলাটি উঠে যাবার পর এক মাঝ বয়সি লোক এসে বসল পাশে। স্বাস্থ্য ভালো হলেও মনোযোগের কোনো হেতু নেই। কিন্তু তিনি নিজেই মনোযোগ কেড়ে নিলেন। স্বাস্থ্যের সুবাদে তানার বাহুতে বাহু জুড়ে রইল। মেয়েদের একটা ঘ্রাণ শক্তি আছে যার বলে সে বুঝতে পারে পুরুষের স্পর্শের রকমফের। তানাও টের পেল পাশের লোকটি সুবিধার নয়। সে ব্যাগটাকে বুকের উপর টেনে বসল। সুবিধা হল না। বাধ্য হয়ে ও সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এ কী! ভীড়ের মধ্যে ওর শরীরে ক্রমশ আদর শুরু হচ্ছে যে! তানার মুখটা যেন অদৃশ্য কেউ চাপা দিয়ে দিল। এ তার কাছে নতুন নয়। আজ ওর প্রতিবাদ করার ভাষা নেই, ক্ষমতার মোমবাতি ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। বোবা হয়ে গেছে গ্রাজুয়েট মাইক্রোবায়োলজি অনার্স। শরীর চাটতে কোয়ালিটি লাগে না।

নির্দিষ্ট স্টপেজে নামল ও। তানা হাঁটছে। শরীর ভরা ক্লান্তি, মন ভরা বেদনা, বুক ভরা গ্লানি আর অসুখ। ও একটাও অপরাধ করেনি। তবুও অপরাধী। আজ বা কাল ধরা পড়তেও পারে নাও পারে! কিন্তু নিজেকে শান্ত করবে কোন ওষুধে। গত দুদিন হাতের কাছে থেকেও তানা এঁটো হয়নি। কিন্তু এ ঘটনা কারোর কানে গেলে সে ও তার স্যারের বদনাম হবে। আর ঐ লোকটা, ওর কথা কেউ জানবে না, তানা ছাড়া। ওর বদনাম হবে না কোনোদিন।

তানা হাঁটতে লাগল।

अंतर्मन

रीना कुमारी
(सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग)

अंतराल, विकराल, गगन घोर अंधकार,
धुंधला पर एकांत शोर
घिर रहीं हैं अतृप्त आकांक्षाएँ,
कभी इस ओर कभी उस ओर।
छिटककर निकलना चाहती हैं,
फैलकर चारों ओर;
पर कैद है अंधेरे में.....
धधकती है प्रज्वलित अग्नि
ज्वलन्त, शान्त, निर्मल
धाराओं के वेग में
कभी इस ओर कभी उस ओर।
चीरकर जाना चाहती है
भेदकर चारों ओर;
निकृष्ट निर्जन वन में....
क्या, क्यों, कब, कैसे
सोचते हैं प्रश्न नए
उस प्रश्न की तलाश में
कभी इस ओर कभी उस ओर।
सबबताना चाहती है
चित्कारकर चारों ओर;
पर नि:शब्द, निर्वाक्य, ध्वनिहीन....

आतंकवाद

रीना कुमारी
(सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग)

गिर रहीं हैं लाशें
बह रहा है लहू
हो रहा सरेआम कत्लेआम;
ध्वस्त हो रही सारी आवाम।
हिन्दू की हिन्दूत्वता,
मुस्लिम की मुसलमानियत,
बेबस लाचार हो झाँकती;
बिलखती मासूम नजरों से।
हैवानियत कर रही अट्टहास,
हिंसा, दहशत, आतंक का आकाश।
बिखरे पड़े हैं चिथड़े
इंसानियत के वजूत के।
आँखें में आँसू, सूना आँचल लिए,
अनाथ खड़ी सोचती है जिन्दगी;
हो रहा क्यूँ यह नरसंहार!
मानवता भी चित्कार करती।
कहती, बस कर....
ऐ, धर्म के नुमाइन्दे,
मुझे भी तो जरा सा जी लेने दे
इस दुनिया जहाँन में
मैनें सुना है,
यहाँ मानव भी रहा करते हैं.....

अंधेरों के सपने मेरे

रीना कुमारी
(सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग)

धुँधले परदों की ओट से,
दो आँखें घूरती हैं बार-बार।
उनमें भरी वह असीम आकाक्षाएँ,
शिथिल कदमों को झकझोरती हैं,
शायद कुछ कहने को हर बार, हर बार।
पर शायद कहीं कुछ अदृश्य अवरोध;
आगे उठते कदम मेरे थम जाते हैं,
सामाजिक पहरेदार मुझे घूरते हैं।
मैं डर जाती हूँ! क्या मैं डर गई?
मेरे कदम फिर उठते हैं.....
नियमों-बंधनों के दरवाजें उल्लांघकर,
आगे बढ़ते हैं-और आगे, और आगे।
उस धुँधली झलक की तलाश में
जिसे यह दुनिया भी देख सके। वह-
कुछ और नहीं! मेरी इच्छा, मेरे सपने ही तो हैं,
देखा था जिसे मैंने अंधेरे अपने संसार में.....।

सरस्वती-वन्दना

राघवेन्द्र मिश्र
(सहायक प्राध्यापक, मानव शरीर विज्ञान विभाग)

सृष्टि का प्रारम्भ
फैला था सर्वत्र तिमिर महाकार-
एक मनोहर मूर्त्ति हुई साकार,
शुभ्र वर्ण, शुभ्र ही परिधान,
शुभ्र वीणा-पद्म, शुभ्र मराल,
नगों के तुंग श्रृंग से विकिरणित हो फैला,
(ज्ञान का) विमल शुभ्र प्रकाश।
अज्ञानाडम्बर-अंधकार का टूटा फैला जाल।

बाढ़

राघवेन्द्र मिश्र
(सहायक प्राध्यापक, मानव शरीर विज्ञान विभाग)

बाढ़! चारो ओर मचाती हाहाकार, बाढ़!
कईयों के प्राणों को हरती,
मैदानों के फसलों को चरती,
धरती रूप विकराल -
बाढ़! चारो ओर मचाती हाहाकार, बाढ़!
विपुल-वारि-समूह संग प्रबल प्रवाह
उफनता नीर, तोड़ता सरिता-तीर,
करता द्रूम निर्मूल;
पहुँचता शहर और ग्राम इस प्रकार—
बाढ़! चारो ओर मचाती हाहाकार, बाढ़!
आती, लाती आकूत जल भण्डार,
डूब जाए जिसमें खड़ा नाग,
कभी तरू शिखर को सिफर करती,
कभी आती अचानक और मचाती चहुँ ओर चित्कार—
बाढ़! चारो ओर मचाती हाहाकार, बाढ़!
विषधर विषदंश गड़ाना भूल,
तरू की डाली पर रहते झूल,
खग गगन में गमन करते,
जीव लंगूर की भाँति वृक्ष पर लटकते;
व्याप्त होता चहुँ ओर जल अपार—
बाढ़! चारो ओर मचाती हाहाकार, बाढ़!
नावों पर होते घर तैयार,
जीवन होता दाने-दाने को मोहताज,
पूर्ण तब मानव करता कणाद तप,
जाते कितने जीवन इसमें खप;
करते इससे उबरने का इन्तजार—
बाढ़! चाहो ओर मचाती हाहाकार, बाढ़!

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला

राघवेन्द्र मिश्र
(सहायक प्राध्यापक, मानव शरीर विज्ञान विभाग)

किस सूर्य की विमल कांति से साहित्य निशा छट पाई?
किसकी 'अनामिका में आकर काव्य अंगूठी में चमक आई?
किसने उतारा साहित्य को कल्पित-गगन की ऊँचाईयों से?
किसने कविता को अवगत कराया जीवन की सच्चाइयों से?
किसने कविता को 'छाया' से 'प्रगति' और 'प्रयोग' का पथ दिखलाया?
किसने 'बादल राग' की धारा प्रवाहित कर भारत को 'फिर एक बार जगाया?
किसने 'समन्वय' स्थापित किया था अनेक वादों के बीच?
किस 'मतवाले' ने किया साहित्य-क्रान्ति-बीज अंकुरित परतंत्रता बीच?
किसकी रचनाओं पर पड़ा नरेन्द्रारविन्द के दर्शन का प्रभाव?
किसने शिव सम हलाहल पी साहित्य जगत को दिया पीयूष प्रवाह?
किसके आह्वान पर 'बादल' गरजे आये घन पावस के?
विनयावनत हुआ यश सामने सिक अध्यावसायी के?
किसके 'कुकुरमत्ते' ने 'चाबुक' मारा; फटकारा फारस के गुलाब को?
किसकी 'सरोज स्मृति' लाई व्याप्त रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह-सैलाब को?
किसकी 'गीतिका' ने की अर्चना तम हरने की विद्या-वरदायिनी-वागिसा से?
किसकी कामिनी 'तोड़ती पत्थर' थी अपने कोमल कर से?
किसने वैषम्य की 'बेला' में साम्यवाद का प्रशस्ति गीत गाया?
किसने अपने अल्प प्रयासों से काव्य कला में अणिमा' सिद्धी को पाया?
किसने काव्य 'अलका' को निरूपमा' 'अप्सरा' सी 'संध्या-सुन्दरी' बनाया?
किसका हृदय 'दीन' विधवा' की दशा निरश अकुलाया?
किसने 'राम की शक्ति पूजा' कर एक नव शक्ति का उद्घोष किया?
किसने 'तुलसीदास' की 'आराधना' कर नवल-ज्योत्सना का संचार किया?
किसके उपवन में खिली थी शेफालिका', 'जूही की कली' और 'लीली?
किसकी कलम की महिमा से अमर हुआा चमार चतुरी?
किसने हिन्दी को पहनाई 'रविन्द्र-कविता-कानन' के पुष्पों की माला?
वह महाकवि महाप्राण सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'।

विधालय मे मुझको भी जाना है

नेहा साव
(बि.ए., प्रथम वर्ष)

मैया! मुझको भी,
लिखना-पढ़ना, सिखला दी।
क. ख. ग. घ., ए. वी. सी. डी,
गिनती भी बतला दी।।
पढ़ लीख कर मै,
मम्मी-पापा जैसे काम करुँगी।
दुनिया भर में।
बापू जैसा अपना नाम करुँगी।।
रोज-सवेरे, साथ तुम्हारे,
मै भी उठा करुँगी।
पुस्तक लेकर पढ़ने मे,
मै संग मे जुटा करुँगी।।
बस्ता लेकर बिद्यालय में,
मुझको भी जाना है।
इण्टरवल मे टिफिन खोल कर
मुझको भी खाना है।।
छुट्टी मे गुड़िया को
ए. बी. सी. डी सिखलाऊँगी।
उसके लिए पेंसिल और।
एक कॉपी भी लाऊँगी।।

भारतबर्ष

चंन्दन सिंह
(सह सभापति, छात्र नेता एवं पूर्व छात्र)

दूर देश से आयें पंक्षी
भारत में बस जाये।
भारत ऐसा देश है,
जहा हर जीव सुख पाये।
सभी धर्म के लोग यहाँ,
रहते हैं भाई चारे से।
ईद मनाते, दीवाली मनाते, बैशाखी
मनाते खुशीहाली से।
देश-देश में गाँव-गाँव मे।
एक ही सबका नारा है।
हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई
भारत देश हमारा है।

प्रातः उठना सीखो

चंन्दन सिंह
(सह सभापति, छात्र नेता एंव पूर्व छात्र)

प्रातः शीघ्र तुम उठना सीखो,
और पुस्तक को पढ़ना सीखो।
माता पिता को करो प्रणाम,
और ईश्वर का लो तुम नाम।
तत्पश्चात् सैर को जायो,
उछलो, कूदो, दौड़ लगाओ।
चिड़ियाँ जल्दी उठ जाती है,
काम पर अपने लग जाती है,
सूरज जल्दी उग आता है,
प्रकाश चहुँ ओर फैलाता है,
सुबह उठो सदा तुम बच्चो,
खुली हवा में खेलो बच्चो।
गर प्रातः तुम सदा उठागे,
स्वस्थ होगे, सुखी रहोगे।

सात कविताए

संजीव कु. पासवान

प्यारी मम्मी

मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी
दुनिया की सबसे न्यारी मम्मी
जब मै रोऊँ प्यार से मुझको
अपने आंचल में छिपाती है।
कभी बीरबल कभी अकबर
की कहानियाँ सुनाती है।
चंदा मामा, सूरज चाचा
कह कर सुलाती है।
'अ' से आम, 'अ' से अनार
पढ़कर मुझे सिखाती है।
ममता की सागर सी लगती,
मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी।

मेरी अम्मा

चिंतन दर्शन जीवन सुजन
रुह नजर पर छायी अम्मा।
सारे घर का शोर-सराब,
सूनापन तनहाई अम्मा।
जिसने खुद को खोकर,
मुझे दिया एक नया आकार।
धरती-अंबर आग, हवा, जल
वह सच्चाई है मेरी अम्मा।

जीवन एक पहेली

जीवन एक चुनौती है,
इसे ललकारो।
जीवन एक सहारा है,
इसे अपनाओं।
जीवन एक दुख है,
इसका सम्मान करो।
जीवन एक प्रतिज्ञा है,
इसे पूरा करो।
जीवन एक कर्तव्य है,
इसका पालन करो।
जीवन एक खेल है,
इससे कुछ सिखो।
जीवन एक फूल है,
इसे खिलने दो।
जीवन एक पहेली है,
तुम इसे सुलझाओ।

एक लड़की

लड़की है तो क्या हुआ,
तूफानों से नहीं डरना है,
दुख में धीरज धरना है,
खुद ही राह बनाना है,
समय का पालन करना है,
सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है,
मिल-जुल कर राह बनाना है,
कुछ ऐसा कर दिखाना है।
तब दूर नही होंगी मंजिले,
आसमान को छुने की,
तब सपने कुछ ऐसे होंगे,
जैसे आसमान में लाखों तारे है।

सदा मुक्साती है माँ

बच्चे को रोता देख,
माँ दौड़ी चली आती है।
बच्चे की हर खुशी का ख्याल,
रख सदा मुस्काती है।
जख्म होता है, भले ही बच्चे को
दर्द सदा ही माँ को होता है।
सारा कष्ट झेल कर पालती हमें
दिल में कितना प्यार होता है।
लोग सच ही कहते है,
माँ के चरणों में,
सारा संसार होता है।

मेरी माँ

खुद रातों की जाग-जाग कर,
मुझे सुलाया करती थी।
बिस्तर जब मैं गिला करता,
माँ गोद उठाया करती थी।
खुद गिले बिस्तर पर सो कर,
दूध पिलाया करती थी।
मेरी तोतल बोली सुनकर
मन ही मन-मन मुस्कराती भी।
हल्की-हल्की थपकी देकर
लोरी मुझे सुनाती थी।
भाग-भाग मैं जब बाहर जाता,
मुझे पकड़ वो लाती थी।

उफ। यह मैथ

अर्थमेटिक, जियोमटरी बड़ी बेकार,
रात मे पढ़ें तो दिन में सोता।
टीचर की बात समझ नहीं आती,
सिम्पलि फिकेशन का है,
सबसे बुरा हाल।
परसेंटेज भी है बेहाल,
प्रॉफिट लास तो हम कर लेने,
डंसिमल में प्वाइंट आगे पीछे ही जाते।
सिंपल इंटरेस्ट की जब बारी आती,
प्रिंसिपल रेट समझ नही आती।
रुंगल-ट्राइंगल तो हम कर लेते,
हुरिया वोल्यूम में हम पीछे रहते।
रात-रात भर मैथ बनाते पर,
स्कूल में सवाल गलत कर आते।
मम्मी की यह इच्छा रहती,
मेरा बेटा सौ में सौ लाता।
काश यह सपना पूरा हो जाता!

अपनी बातों का अर्थ जाने

सूरज कुमार राय
(बी० एस.सी०, ऑनर्स)

एक महात्मा कुछ शिष्यों के साथ जंगल की एक कुटिया में रहते थें। एक शिष्य था, जो पशु एवं पक्षियों से बहुत प्यार करता था, एक दिन वह पिंजरे में सुन्दर सा तोता ले आया और उसे कुटिया के पास टांग दिया, महात्मा ने कहा-वस्त, मेरा मानना है कि किसी भी जीव की स्वतंत्रता तुम्हें नहीं छीननी चाहिए और तुम्हें इसे आजाद कर देना चाहिऐ, शिष्य विनम्रता से बोला - गुरु जी, मेरी बहुत दिन से यह तमन्ना थी, बहुत मुश्किल से इसे लेकर आया हूँ। यदि आप मेरा आग्रह स्वीकार कर लें, तो मुझे बहुत खुशी होगी।

शिष्य का मन देखकर महात्मा जी कुछ नहीं बोले, पर अकसर उनका मन करता है कि वह तीते की आजाद कर दे। एक दिन उन्होंने सोचा कि यदि तोते को यह बोलना सिखा दूं कि "पिंजरे से बाहर निकलो और आजाद होकर उड़ जाओ," तो तोता इसे समझ कर मौका पाते ही वह स्वयं उड़ जाएगा।

जब भी शिष्य भिक्षा के लिए बाहर जाता तो महात्मा तोते की सिखाने लगते, धीरे-धीरे तोता ने सीखना शुरु कर दिया। एक दिन महात्माजी शिष्यों के साथ बाहर गये। पिंजरे का दरवाजा गलती से खुला रह गया और तोता बाहर निकल कर घूमने लगा। वह महात्मा जी के सिखायी हुई बातों को दुहरा रहा था। थोड़ी देर में महात्मा जी के वापस आने पर तोता फिर से पिंजरे में घुस गया, लेकिन उसके जबान पर अभी वही वाक्य थे। यह देखकर महात्मा जी आश्चर्यचकित होकर मन ही मन बोले, काश। अगर तोते की यह पता होता कि वह क्या बोल रहा है तो वह आज आजाद होता, इसने केवल शब्द याद किये, अर्थ समझने की सहमत नहीं उठाई, यह कहानी केवल एक अच्छे छात्र एवं छात्रा के लिये है।

साधु की सिख

नेहा साव
(बि. ए., प्रथम वर्ष)

किसी गाँव मे एक साधू रहा करता था, वह जब भी नाचता तो बारिश होती थी। अत: गाँव के लोगो को जब भी बारिश की जरुरत होती थी, तो, वो लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते की वे नाचे, और वो जब नाचने लगते तो बारिश जरुर होती।

कुछ दिनो बाद चार लड़के गाँव में घूमने आये, जब उन्हे ये बात मालूम हुई की किसी साधु के नाचने से बारिश होती है, तो उन्हे यकीन नही हुआ।

शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड मे उन्होने गाँव वालों की चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था अगले दिन सुबह-सुबह गाँब वाले उन लड़को को लेकर साधु की कुटिया पर पहुँचे।

साधु को सारी बात बताई गई, फिर लड़को ने नाचना शुरु किया, आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बादल नही दिखे। कुछ देर मे दूसरे लड़के ने भी यही किया और एक घंटा बीतते बीतते बाकी दोनो लड़के भी थक गये, पर बारिश नही हुई।

अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया, एक घंटा बीता, बारिश नही हुई, साधु नाचता रहा, दो घंटा बीता बारिश नही हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नही ले रहा था धीरे धीरे शाम ढलने लगी की तभी बादलों को गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरो की बरिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और वोले,

"बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नही हुई और आपके नाचने से हो गई।"

साधु ने उत्तर दीया "जब मैं नाचता हुँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ पहली बात मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा और दूसरी ये कि में तब तक नाचूँगा जब तक कि बारिश न हो जाये"।

दोस्तो सफलता पाने वाले में भी यही गुण बिद्यमान है वो जिस चीज की कामना करते है उसमें उन्हे सफल होने का पूरा यकीन होता है। और वे तब तक उस चीज को करते है जब तक कि उसमे सफल ना हो जाए। इसलिए सफलता हासिल करनी है तो उस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।

The Most Beautiful Formula

Dr. Priyotosh Dutta
(Department of Chemistry)

We may paraphrasing the famous sentence of George Orwell- say, that 'all mathematics is beautiful, yet some is more beautiful than the other'. 'Mathematics' means a lot of things-concepts, theories, deduction, proof, symbols etc and formula. Before we enjoy the beauty of the most beautiful formula, let us have a look on some interesting remarks on mathematics, mathematician and formula :

> *A man is like a fraction whose numerator is what he is and whose denominator is what he thinks of himself. The larger the denominator, the smaller is the fraction.*
>
> —C. Lev Tolstoy.
>
> *How can it be that mathematics, being after all a product of human thought independent of experience, is so admirably adapted to the objects of reality?*—Albert Einstein.
>
> *A mathematician is a blind man in a dark room looking for a black cat which isn't there.* —Charles Darwin.
>
> *In great mathematics there is a very high degree of unexpectedness, combined with inevitability and economy.* —G.H. Hardy.
>
> *There is no branch of mathematics, however abstract, which may not some day be applied to phenomena of the real world.* —Nikolai Lobatchevsky.

The formula we are going to talk about is a discovery of the remarkable connection between the exponential and the trigonometric functions, by all time great Mathematician, *Euler*. Euler was a great experimental mathematician. He played with formulas like a child playing with toys. Kanser and J. Newman, in *Mathematics and the Imagination*, write *It (this formula) appeals equally to the mystic, the scientist, the philosopher, the mathematician.* Physicist Richard Feynman wrote in his notebook in bold scrawl, when he was fifteen: THE MOST REMARKABLE FORMULA IN MATH.

What is that formula? How did he get it? Why it is *beautiful?* Why is it so special? It is

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Let us start with the Taylor's Series:

$$f(x) = f(x-a)f'(a) + \{(x-a)^2/2!\}f''(a) + \{(x-a)^3/3!\}f'''(a) + \ldots; \text{ take } a=0$$

$$f(x) = f(0) + x\ f'(0) + (x^2/2!)\ f''(0) + (x^3/3!)\ f'''(0) + \ldots$$

Example 1 $\sin(x) = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + x^9/9! - \ldots$

Example 2 $\cos(x) = 1 - x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! + x^8/8! - \ldots$

Example 3 $e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + x^4/4! + x^5/5! + x^6 + x^7/7! + \ldots$

Here, x is real variable. Euler boldly replaced x by immaginary number, say $z = iy$

$$e^{iy} = 1 + (iy) + (iy)^2/2! + (iy)^3/3! + (iy)^4/4! + (iy)^5/5! + (iy)^6/6! + (iy)^7/7! + \ldots$$

Replacing x by iy is like playing with meaningless symbols, but Euler had enough faith in his formula to make it meaningful. Thus we get,

$e^{iy} = 1 + iy - y^2/2! - iy^3/3! + y^4/4! + iy^5/5! - y^6/6! - iy^7/7! + \ldots$

Here comes another bold step from Euler. And that is changing the order of terms in the above expression, which is not necessarily valid for an infinite series.

$= (1-y^2/2! + y^4/4! - y^6/6! + \ldots) + i(y - y^3/3! + y^5/5! - y^7/7! + \ldots)$

$e^{iy} = \cos(y) + i \sin(y)$ [from example 1,2];

and similarly $e^{-iy} = \cos(y) - i \sin(y)$.

Take $y = \pi$, $e^{i\pi} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1$

$e^{i\pi} + 1 = 0$, The most Beautiful formula.

Why is it beautiful?

The answer becomes vividly apparent if we look the salient features of it:

(i) The formula involves three most important mathematical operations- addition, multiplication and exponentiation.

(ii) The formula connects the *five* most important constants in mathematics: e, π, i, 0 and 1.

(iii) It includes four major branches of classical mathematics: arithmetic (through 0 and 1), algebra (by i), geometry (by π), and analysis (by e).

Often we say, Simple is beautiful. If it's so, then the formula must be beautiful. If beauty is attributed to profound, something sensational, if beauty takes your imagination far high, then this formula of course is beautiful. Finally, if you are happy to relate beauty with usefulness and significance, then also we must say : *The formula is beautiful.*

The importance of health, fitness and wellness.

This is an excerpt from foundation of Professional Personal Training with DVD by Canfitpro.

(1) Health is the level of functional or **metabolic** efficiency of a **living organism**. In **humans** it is the ability of individual or communities adapt and self-manage when facing physical-mental or social challenges[1]. The **World Health Organization** (WHO) defined health in its broader sence in its 1948 constitution as 'a state of complete physical, mental and social **well-being** and not merely the absence of disease or infirmity'. This definition has been subject to controversy in particular as lacking operational value and because of the problem created by use of the word "complete" other definitions have been proposed among which a recent definition that correlates health and personal satisfaction.

(2) Primary Components of fitness.

The four primary components (also known as the components of healated fitness) that are important to improved physical health are as follows.

- *Cardiarespiratory Capacity :* The capacity includes aerobic endurance (how long) aerobic strength (how hard) and aerobic power (how fast).
- *Muscular capacity :* Refers to the spectrum of muscular capability.
- *Flexibility :* is the range of movement or amount of motion that a joint is capable of performing. Each joint has a different amount of flexibility.
- *Body Composition :* is the proportion of fat-free mass (muscle, bone, blood, organs and fluids) to fat mass (adipose tissue deposited under the skin and around organs)

(3) Secondary Components of fitness.

The secondary components of fitness (also known as components of performance based fitness) are involved in all physical activity and are necessary for daily functioning. The secondary components include the following.

- *Balance :* is the ability to maintain a specific body position in either a stationary or dynamic (moving) situation.
- *Co-ordination :* is the ability to use all body parts together to produce smooth and fluid motion.
- *Agility :* is the ability to changes direction quickly.
- *Reaction time :* is the time required to respond to a specific stimulus.
- *Speed :* is the ability to move rapidly. Speeds is also known as velocity (rate of motion).
- *Power :* is the product of strength and speed. Power is also known as explosive strength.
- *Mental Capability :* is the ability to concentrate during exercise to improve training effects as well as the ability to relax and enjoy the psychological benefits of activity (endorophins)

(4) Health and Wellness : Health is a dynamic process becuase it is always changing. We all have times of good health, time so sickness and maybe even times of serious illness. As our lifestyles change. So does our level of health. We strive toward an optimal state of well-being. Physical health is only one aspect of our overall health. The other components of health (Greenberg, 2004, P.7) that are just as important as physical health include the following.

- ⋆ ***Social health :*** The ability to interact well with people and the environment and to have satisfying personal relationships.
- ⋆ ***Mental health :*** The ability to learn and grow intellecutaly. Life experiences as well as more formal structure (e.g. school) enhance mental health.
- ⋆ ***Emotional health :*** The ability to control emotions so that you feel comfortable expressing them and can express them appropriately.
- ⋆ ***Spiritual health :*** A belief in some unifying force. It veries from person to person but has the concept of faith at is core. If our focus is strictly on the physical benefits exercise, we are doing a to our clients and we are not fulfilling our professional obligation.

(5) Benefits of Physical Activity : As fitness professionals, we spend a great real of time inspiring and assisting others in their pursuit of improved health. Educations an important aspect of this. We must promote the benefits of regular activity and help people understand why they should be active. Figure 1.2 will help you educate your clients about the benefits of activity and why each of these benefits is important to long term health.

- ⋆ ***Activity Guidlines :*** Health Canada introduced Canada's Physical Activity Guide to Health Active living to help Canadians make wise choices about physical activity. The recommendations in the Physical Actiivity Guide ara as follows.
- ⋆ ***Endurance :*** On 4 to 7 days week, perform continous activity for heart, longs and circulatory system. Time required for improvements depends on effort.
- ⋆ ***Flexibility :*** On 4 to 7 days a week, perform gentle reaching, bending and strecthing to keep muscles relaxed and joints mobile.
- ⋆ ***Strength :*** On 2 to 4 days a week, Perform ressistance exercise to strenghten muscles and bones and improve posture.

Perform : 30 minutes or more of moderate-intensity physicaly activity on most days of the week for car diovascolor health. The 30 minutes need to be comfirm .

Perfomring : 1 set of 8 to 12 repetitions or resistance training for the entire body is necessary to maintain and develop muscular strength and endurance.

Flexibility : training should be performed daily, including strethches for all majors muscle groups in order to maintain mobility.

WHY IS INDIA POOR?

Work is less and grossip is more
Silence is less and noise is more
Thinking is less and copying is nose.
Followery are less and leaders are more
Country is lesy and self is more.
Shame is less and shamelessness is more
Bravery is less and cowdarlic is more
Pity is less and curelty is more
Duties are less and rights are more.
Administration is less and administrators are more.
Production is less and population is more.
That's the reason "Why India Is Poor".

NEW ELEMENTS IN PERIODIC TABLE

Chemistry text books as we know it, are officially out of date, as four new elements will soon be added to the periodic table.

Elements 113, 115, 117 and 118 have formally been recognized by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), the U.S based world authority on chemistry. The organization's announcement on december 30 means the seventh row of the periodic table is finally complete..

It's the first time the time table bas been updated since 2011, when elements 114 (Flerovium) and 116 (Livermorium) were added. Devised by Russian Chmist Dimitri Mendelev in 1869, the table categorizes chemical elements according to their atomic number.

"The Chemistry community is eager to see its most cherished table finally being completed down to the seventh row." Said Jan Reedijk, President of the Inorganic Chemistry Division of IUPAC in a statement.

"IUPAC has now initated the process of formalizing names and symbols for these elements temporari `ly named as (Uut or elements 113) Ununpentium and (.... or elements 118) Ununoctium."

A Russan-American team at the joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Oak Ridge National Laboratory in Tennessee and Lawrence Livermore, National Laboratory in California discovered elements 115, 117 and 118 while Japanese researchers were credited for discovering element 113.

All four elements are not elements found in nature and were synthetically created in laboratories. Until now, these elements had temporarily named and symbols on the periodic table as their existence was hard to prove. Since they decay extreme quickly Scientists found it difficult to reproduce them more than once.

Japanese researchers said their search for element 113 began by bombarding a thin layer of bismuth with zincions travelling at about 10% the speed of light. By doing so, they would theoretically fuse, forming an atom of element 113.

With the discover process is now over, researchers have another tricky task at hand coming up with permanent names and symbols for the elements.

According to the IUPAC, new elements can be named after a mythological concepts, a mineral, a place or country, a property or a scientists.

After the proposed names are submitted they will be open for public review for five months before the organization makes a final decision.

Source : CNN

KNO_3

Potassium nitrate.
Don't hate.
It's great.
It can act as an
Oxidizer.
It has a crystalline
Structure.
It's a key ingredient
in gun powder.
K-N'O – Three!
Don't give no grief.
It can be used to
make corn beef.
It's also known as
Salt peter.

Some accidental inventions and funny stories behind them

(1) Anesthesia.

Inventor : Horace Wells

Year : 1844

What happened : In its salad days nitrous oxide was strictly a party toy. Since it made people howl like hyena. But a friend of him took too much of the stuff at a laughing gas stage show and gashed his leg.

Big Discovery : The friend hadn't realized he'd hurt himself.

As a result : Nitrous Oxide became an early form of anesthesia.

(2) Saccharin.

Inventors : Constantin Fahlberg and Ira Remsen.

Year : 1879

What happened : After spending the day studying coal tar derivatives, Fahlberg left his Johns Hopkins laboratory and went to dinner.

Big discovery : Something he ate tasted particularly sweet, which he traced to a chemical compound he'd spilled on his hand. Best of all, it turned out to be calorie free.

As a result : He cut Remsen and the university out of millions of dollars when he secretly patented the break through discovery Saccharin.

(3) The microwave

Inventor : Percy Spencer.

Year : 1946

What happened : With the end of the World War II, the Raytheon engineer was looking for other uses for the magnetron, which generated the microwaves for radar system. While Spencer

was standing next to the device one day a chocolate bar in his pocket melted.

Big discovery : The magnetron worked even better on pop corn.

As a result : Spencer became very rich.

(4) Viagra

Inventors : Scientists at Pfizer.

Year : 1992

What happened : A wel she hamlet was ground zero for a test on a pill to fight angima. Unfortunately for the afficated, it had little success against the diseare.

Big discovery : Though it didn't work, the men taking part in the study refused to give up.

As a result : The scientists switch gears and marketed the drug viagra for a very different purpose.

(5) Bandy

Inventor : A dutch shipmaster.

Year : 16th century.

What happened : He used heat to concentrate wine in order to make it easier to transport, with the idea of adding water to reconstitute it when he arrived.

Big discovery : Concentrated wine is better than watered down wine.

As a result : 'Burnt Wine' or 'brandewijn' in dutch became a big hit, call it brandy, since after a few drinks of the stuff; there is no way you can pronounce brandewijn, so a bartender can understand what you are ordering.

(6) Chewing Gum

Inventor : Thomas Adams

Year : 1870

What happened : He was experimenting with chickle, the sap from a south american tree as a substitute for rubber. After mounting failures, he dejected inventors popped a piece into his mouth.

Big discovery : He liked it.

As a result : Adams New York number one became the first mass produced chewing gum in the world.

The Nobel Prize

Prof. Dr. Tapan Kumar Maitra
(Department of Botany)

On 10 December each year, the king of Sweden awards the Nobel Prizes at the Stockholm Concert Hall. The date is the anniversary of Alfred Nobel's death. Awards are given annually in physics, chemistry, medicine and physiology, literature, economics, and peace. In 2000, each award was worth $900,000, although an award sometimes goes to two or three recipients. The prestige is priceless.

Winners of the Nobel Prize are chosen according to the will of Alfred Nobel, a wealthy Swedish inventor and industrialist, who held over three hundred patents when he died in 1896 at the age of sixty-three. Nobel developed a detonator and processes for detonation of nitroglycerine, a substance invented by Italian chemist Ascanio Sobrero in 1847. In the form. Nobel developed, the explosive was patented as dynamite. Nobel also invented several other forms of explosives. He was a benefactor of Sobrero, hiring him as a consultant and paying his wife a pension after Sobrero died.

Nobel believed that dynamite would be so destructive that it would serve as a deterrent to war. Later, realizing that this would not come to pass, he instructed that his fortune be invested and the interest used to fund the awards. The first prizes were awarded in 1901. Each award consists of a diploma, medal, and check.

American, British, German, French, and Swedish citizens have earned the most prizes (table 1). Table 2 features some highlights of Nobel laureate achievements in genetics.

The Nobel Medal. The medal is half a pound of 23-karat gold, measures about $2^1/_2$ inches across, and has Nobel's face and the dates of his birth and death on the front. The diplomas that accompany the awards are individually designed.

Table 1 Distribution of Nobel Awards to the Top Five Recipient Nations (Including 2000 Winners)

	Physics	Chemistry	Medicine and Physiology	Peace	Literature	Economics	Total
United States	77	46	88	20	9	30	270
Britain	20	24	25	9	8	5	91
Germany	18	27	15	4	6	1	71
France	12	7	7	8	12	1	47
Sweden	4	4	7	5	7	2	29

Table 2 Some Nobel Laureates in Genetics (Medicine and Physiology; Chemistry)

Name	Year	Nationality	Cited for
Thomas Hunt Morgan	1933	USA	Discovery of how chromo somes govern heredity
Hermann J. Muller	1946	USA	X-ray inducement of mutations
George W Beadle	1948	USA	Genetic regulation oi biosyn thetic pathways
Edward L. Tatum	1958	USA	
Joshua Lederberg	1958	USA	Bacterial genetics
Severo Ochoa	1959	USA	Discovery of enzymes that syn thesize nucleic acids
Arthur Kornberg	1959	USA	
Francis H. C. Crick	1962	British	Discovery of the structure of DNA
James D. Watson	1962	USA	
Maurice Wilkins	1962	British	
Francois Jacob	1965	France	Regulation of enzyme biosyn thesis
Andre Lwoff	1965	France	
Jacques Monod	1965	France	
Peyton Rous	1966	USA	Tumor viruses
Robert W Holley	1968	USA	Unraveling of the genetic code
H. Gobind Khorana	1968	USA	
Marshall W Nirenberg	1968	USA	
MaxDelbruck	1969	USA	Viral genetics
Alfred Hershey	1969	USA	
Salvador Luria	1969	USA	
Renato Dulbecco	1975	USA	Tumor viruses
Howard Temin	1975	USA	Discovery of reverse transcriptase
David Baltimore	1975	USA	
Werner Arber	1978	Swiss	Discovery and use of restriction endonucleases
Hamilton Smith	1978	USA	
Daniel Nathans	1978	USA	
Walter Gilbert	1980	USA	Techniques of sequencing DNA
Frederick Sanger	1980	British	
Paul Berg	1980	USA	Pioneer work in recombinant DNA
Baruj Benacerraf	1980	USA	Genetics of immune reactions
Jean Dausset	1980	France	
George Snell	1980	USA	
Aaron Klug	1982	British	Crystallographic work on protein-nucleic acid complexes
Barbara Mc Clintock	1983	USA	Transposable genetic elements
Cesar Milstein	1984	British	Immunogenetics Argentine
Georges Koehler	1984	German	
Niels K. Jerne	1984	British/Danish	
Susumu Tonegawa	1987	Japanese	Antibody diversity

Name	Year	Nationality	Cited for
J. Michael Bishop	1989	USA	Proto-oncogenes
Harold E. Varmus	1989	USA	
Thomas R. Cech	1989	USA	Enzymatic properties of RNA
Sidney Altaian	1989	Canada	
KaryMullis	1993	USA	Polymerase chain reaction
Michael Smith	1993	Canada	Site-directed mutagenesis
Richard Roberts	1993	British	Discovery of intervening sequences in RNA
Phillip Sharp	1993	USA	
F.B.Lewis	1995	USA	Genes control development
Christiane Nusslein-Volhard	1995	German	
Eric Wieschaus	1995	USA	
Stanley B. Prusiner	1997	USA	Discovery of prions
Gunter Blobel	1999	German	Signal recognition during protein synthesis.

Bioenergatics

Dr. Tapan Kumar Maitra
(Department of Botany)

The principles that govern energy flow are incorporated in an area of science that the physical chemist calls thermodynamics. Although the prefix *thermo-* suggests that the term is limited to heat (and that is indeed its historical origin), thermodynamics also takes into account other forms of energy and processes that convert energy from one form to another. Specifically, thermodynamics concerns the laws governing the energy transactions that inevitably accompany most physical processes and all chemical reactions. Bioenergetics, in turi|, can be thought of as *applied thermodynamics—that* is, it concerns the application of thermodynamic principles to reactions and processes in the biological world.

To Understand Energy How, We Need to Understand Systems, Heat, and Work

It is useful to define energy nol simply as the ability to do work but specifically as the ability to cause change. Without energy, all processes would be at a standstill, including those that we associate with living cells.

Energy exists in a variety of forms, many of them of interest to biologists. Think, for example, of the energy represented by a ray of sunlight, a teaspoon of sugar, a moving flagellum, an excited electron, or the concentration of ions or small molecules within a cell or an organelle. These phenomena are diverse, but they are all governed by certain, basic principles of energetics.

Energy is distributed throughout the universe and for some purposes it is necessary to consider the total energy of the universe, at least in a theoretical way. Usually, however, we are interested not in the whole universe but only in a small portion of it. We might, for example, be concerned with a reaction or process occurring in a beaker of chemicals, in a cell, or in a block of metal. By convention, the restricted portion of the universe that one wishes to consider at the moment is called the **system,** and all the rest of the universe is referred to as the **surroundings.** Sometimes the system has a natural boundary, such as a glass beaker or a cell membrane. In other cases, the boundary between the system and its surroundings is a hypothetical one used only for convenience of discussion, such as the imaginary boundary around one mole of glucose molecules in a solution.

Open and Closed Systems. *A system is that portion of the universe under consideration. The rest of the universe is called the surroundings of the system, (a) An open system can exchange energy with its surroundings, whereas (b) a closed system, cannot. The open system can use incoming energy to increase its orderliness, thereby decreasing its entropy. The closed system' tends toward equilibrium and increases its entropy. All living organisms are open systems, exchanging energy freely with their surroundings.*

Systems can be either open or closed, depending on whether or not they can exchange energy with their surroundings. A *closed system* is sealed from its environment and can neither take in nor release energy in any form. An *open system,* on the other hand, can have energy added to it or removed 'rom it. As we will see later, the levels of organization that biological systems routinely display are possible only because cells and organisms are open systems, capable of both the uptake and the release of energy. Specifically, biological systems require a constant, large-scale influx of energy from their surroundings both to attain and to maintain the levels of complexity that are characteristic of them. That is why plants need sunlight and you need food.

Whenever we talk about a system, we have to be careful to specify the state of the system. A system is said to be in a specific state if each of its variable.properties (such as temperature, pressure, and volume) is held constant at a specified value. In such a situation, the total energy content of the system, while not directly measurable, has some unique value. If such a system then changes from one state to another as a result of some interaction between the system and its surroundings, the change in its total energy is determined uniquely by the initial and final states of the system and is not affected at all by the mechanism by which the change occurs or the intermediate states through which the system may pass. This is a very useful property because it allows energy changes to be determined from a knowledge of the initial and final states only.

The problem of keeping track of system variables and their effect on energy changes can be simplified if one or more of the variables are held constant. Fortunately, this is the case with most biological reactions, because they usually occur in dilute solutions within cells that are at approximately the same temperature and pressure during the entire course of the reaction. These environmental conditions, as well as the cell volume, are generally slow to change compared with the speed of biological reactions. This means that three of the most important system variables that physical chemists usually concern themselves with-temperature, pressure, and volume-are essentially constant for most biological reactions.

The exchange of energy between a system and its surroundings occurs in two ways: as heat and as work. Heat is energy transfer from one place to another as a result of a temperature difference between the two places. Spontaneous transfer always occurs from the hotter place to the colder place. Heat is an exceedingly useful form of energy for many machines and other devices designed to accomplish mechanical work. However, it has only limited biological utility because most biological systems operate under conditions of either fixed or only minimally variable temperature. Such isothermal'systems lack the temperature gradients required to convert heat into other forms of energy. As a result, heat is ;not a useful source of energy for cells—although it can be used for such purposes as maintaining body temperature or attracting pollinators, as we noted earlier.

In biological systems, work is the use of energy to drive any process other than heat flow. For example, work is performed when the muscles in your arm expend chemical energy to lift this book, when a corn leaf uses light energy to synthesize sugar, or when an electric eel draws on the ion concentration gradients of its electroplax tissue to deliver a shock. It is the amount of useful energy available to do cellular work that we will be primarily interested in when we begin calculating energy changes associated with specific reactions that cells carry out.

To quantify energy changes during chemical reactions or physical processes, we need units in which energy can be expressed. In biological chemistry, energy changes are usually expressed in terms of the calorie (cal), which is defined as the amount of energy required to warm 1 gram of water 1 degree centigrade (specifically, from 14.5°C to 15.5°C) at a pressure of 1 atmosphere. (Again, note that the unit of energy measurement, like the very term thermodynamics, is based on heat but is applied generally to all forms of energy.) An alternative energy unit, the joule (J), is preferred by physicists and is used in some biochemistry texts. Conversion is easy: 1 cal = 4.184 J, or 1J = 0.239 cal.

Energy changes are often measured on a per-mole basis, and the most common form in which we will encounter energy units in biological chemistry will be as calories (or sometimes kilocalories) per mole (cal/mol or kcal/mol). (Be careful to distinguish between the calorie as defined here and the nutritional Calorie that is often used to express the energy content of foods. The nutritional Calorie is represented with a capital C and is really a kilocalorie as defined here.)

New Members of the Animal Kingdom : A brief insight

Dr. Pallab Ray
(Assistant Professor in Zoology, Ananda Mohan College)

About 8.7 million plants, animals, fungi and single-celled organisms are thought to exist on Earth, although estimates range from 3 million to 100 million (1). Around 1.7 million species have already been classified, but the majority of life on Earth still undescribed or undiscovered (2). It is likely to be tiny, such as bacteria and insects, and may inhabit poorly explored areas such as the deep ocean and soil (1, 2). However, larger animals, such as rodents, snakes, salamanders, and even primates, are still being found (2, 3). Between 1999 and 2010, a overwhelming 615 new species were discovered on the island of Madagascar alone, including 69 amphibians, 61 reptiles and 41 mammals (4).

□ What is a 'new species'?

A newly discovered species may be a species that is completely new to science, or one which has previously been described but is subsequently found to be made up of two or more separate species. To be certain that a discovery is an entirely new species, scientists collect a specimen and compare its characteristics to those of existing species to determine whether or not the specimen is sufficiently different from any other species already described. Extensive review and analysis through checking scientific literature and consulting other experts is also needed before a species can confidently be assigned a scientific name (2). Morphological, behavioural and genetic characteristics are used te identify a species. Scientists analyse key morphological features, for example the shape of the bones or the reproductive organs. Sound or video recordings of a species in the wild may also be used to document behavioural traits, for example specific vocalisations or courtship displays (2).

The analysis of molecular and genetic characteristics, such as chromosome shape or the sequence of a particular segment of DNA, is also an important tool in discovering new species. Genetic bartoding is a process whereby scientists compare a key fragment of DNA from a specimen against the DNA of thousands of other species, and this technique is becoming a vital tool in identifying both new and existing species (2).

Once an organism is confirmed as a new and unique species, it has to be formally described in a recognised scientific publication and assigned a scientific name (2).

□ Who searches for new species?

Discovering new species involves collaboration between scientists, natural history museums, government and non-government organizations, and many other institutions (2). Naming a species new to science requires the expertise of scientists specializing in specific taxonomic groups, such as birds, mammals or insects. Experts in taxonomy are able to confirm a species as unique (2). Expeditions involving teams of scientists aim to uncover and record the wildlife present in given regions. These missions generally target countries with relatively unexplored and remote areas such as humid tropical mountains and limestone caves (2). Examples like "The Search for Lost Frogs"

which was launched in 2010. This campaign saw 126 researchers working in 21 countries documenting species of frog not seen in over a decade. As well as rediscovering a number of species presumed extinct, these expeditions found several potentially new species, including a beaked toad (*Rhinella sp. nov.*) from Colombia (5).

□ How the new species are recorded?

Scientists lead expeditions to some of the most remote corners of Earth, working deep in the world's mountains, savannas, rainforests, rivers and oceans to discover new species. Many species are elusive and difficult to get to, and so scientists have to extensively search likely habitats (2). In order to collect a specimen, traps, such as pitfall traps on the forest floor, may be used. Remote camera traps are used to document shy and elusive species such as rodents. Canopy fogging, where a tree canopy is fumigated with a chemical compound that knocks out all invertebrates, enables entomologists to survey many groups of organisms at once (2). Sound can be an important tool in pinpointing potentially new species. Using special software, scientists are able to analyse sounds recorded in a specific habitat, and identify vocalisations that are different to all known animal songs and calls (2). Many new species are discovered in the field, but many more are discovered in museum and herbaria collections (6). Around three billion specimens are held in collections around the world, and these include some unique species waiting to be identified. The Natural History Museum in London has launched a mission to map 10 million species in 50 years by using expertise from a wide range of fields, sharing worldwide collections, raising public awareness and using new technology.

□ Why should we find new species?

Some of the most threatened species are well documented and help drive interest in conservation. Many undiscovered species may have already gone extinct before being identified. Giving a species a name is the first step towards protecting it from extinction, as once it is identified, efforts to monitor and conserve the species can be put in place (2). Understanding the span of biodiversity will help fill in evolutionary gaps and start to explain the life histories of species oh Earth. Each organism fills a niche position within an ecosystem, and performs services such as flowering plant pollination, nutrient recycling and carbon absorption (2). Understanding threatened ecosystems and the species they contain will enable more comprehensive conservation strategies to be implemented (7). There is also an economic benefit to discovering new species, as each new organism may prove a valuable source of new medicines or food crops, or inspire new technology. So looking for new species is actually a step towards protecting the global biodiversity.

Interesting discoveries from past few years are given here-

☆ Discovered in 2001 : Chestnut eared Laughingthrush (*Garrulax konkakinhensis*) -

Garrulax konkakinhensis is known only from Mount Kon Ka Kinh, one of the highest peaks in the Central Highlands of Vietnam (which is also the origin of the species' scientific name). The three specimens for study were collected between 1,600 and 1,700 m in the undergrowth of primary upper montane evergreen forest. This species measures 22 cm (8.7 in). This laughingthrush has boldly and irregularly barred black and white upperparts, a black-streaked grey forehead, chestnut ear-coverts, and a white-tipped tail with a broad black sub-terminal band.

☆ Discovered in 2002 : The bone-eating snot-flower worm (*Osedax mucofloris*) -

Until a few years ago, "zombie worms" were thought to only exist deep in the ocean. So scientists were astonished when they discovered a new one in just 120 m of water off the Swedish coast. *Osedax mucofloris* were discovered in 2002, on the bones of a decaying grey whale in Monterey Bay, California. *Osedax* is a genus of worms related to earthworms and leeches. They

live in and eat whale and fish bones. Females can grow to 2 cm, with colourful feathery plumes that act as gills, and root-like structures that bury into and dissolve bones to get at the fats and proteins they use as nutrients. Males are much smaller, live attached to the females, and are basically sperm banks.

☆ **Discovered in 2003 :** Kipunji (*Rungwecebus kipunji*) -

Discovered in 2003 & 2004 by two independent research teams, the kipunji became Africa's first new monkey discovery in 20 years (since the sun-tailed monkey in 1984).

The kipunji's loud, distinctive 'honk-bark' call is one of the features that established this primate as a distinct species. Adult male kipunji have been observed at an average length of 85 to 90 cm and are estimated to weigh between 10 to 16 kg. Initially thought to be a species of mangabey, the kipunji has since been found to be more closely related to baboons. Scientists have assigned it to a new genus, Rungwecebus, named after Mount Rungwe, where it is found. The kipunji is endemic to southern Tanzania, and is at risk from logging, charcoal-making, hunting and unmanaged resource extraction.

☆ **Discovered in 2004 :** Dragonfly (*Platycypha eliseva*) -

The dragonfly, *Platycypha eliseva*, discovered in 2004, has a unique combination of colors which differentiate it from other species; specifically the yellow tipped abdomen and the red and white tibiae. The species was found on three clear sandy streams within 5 km of the Congo River. The species may be localized: despite being conspicuous, it is absent from the substantial collections from surrounding areas. Dragonflies are good indicators of water quality since they need clean water, aquatic nymphs feed on other insects and aquatic organisms (predators), and adults are also predatory and thus help to regulate insect populations including mosquitoes. Many dragonfly larvae are voracious predators on mosquito larvae and have been used in human-health programs to control disease-carrying mosquitoes.

☆ **Discovered in 2005 :** The "Yeti" Crab (*Kiwa hirsute*) -

Often mistakenly referred to as the "furry lobster" the "Yeti crab", or *Kiwa birsute*, is named so for its silky blonde hair-like thingies growing on the crustaceans claws. Although it definitely looks awful, the "Yeti" crab might possibly be one of the more complex crustaceans we've ever might actually farm certain types or bacteria on its hairy pincers and then either use them to detoxify dangerous minerals from the deep-sea waters it inhabits, or eat them.

☆ **Discovered in 2006 :** Chewer Squid (*Promachoteuthis sloani*) -

This previously unknown squid was collected from the northern Mid-Atlantic Ridge, a chain of undersea mountains halfway between Europe and North America. The species, called *Promachoteuthis sloani*, was caught along with around 50 other types of squid during trawls as deep as 1.2 miles (3 kilometers) by a Census of Marine Life team. The new species has unusually small, semi-opaque eyes and large numbers of suckers on its arms. The shape of its beak suggests the squid is a powerful chewer. While soft-bodied squid are often damaged during deep-sea trawls, their hard mouthparts are unique to each species and so can be used to help identify different species.

☆ **Discovered in 2007 :** Lesula (*Cercopithecus lomamiensis*) -

The lesula (*Cercopithecus lomamiensis*) is a species of Old World monkey in the Guenon family, found in the Lomami Basin of the Congo. Though known to locals, it was unknown to the international scientific community until it was discovered in 2007 . This monkey is described to have human looking eyes and a blue bottom and adult males have a huge bare patch of skin in the buttocks, testicles and perianal area.

☆ **Discovered in 2008 :** Swirling Snail (*Opisthostoma vermiculum*) -

The shell of the fantastic Opisthostoma vermiculum snail looks rather more like an elaborate musical instrument than a product of Darwinian evolution. Although most snails

Chestnut eared Laughingthrush, 2001

The bone-eating snot-flower worm, 2002

Kipunji, 2003

Dragonfly, 2004

The "Yeti" Crab, 2005

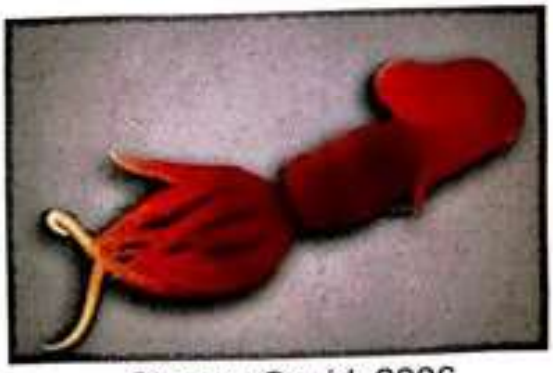

Chewer Squid, 2006

Lesula, 2007

Swirling Snail, 2008

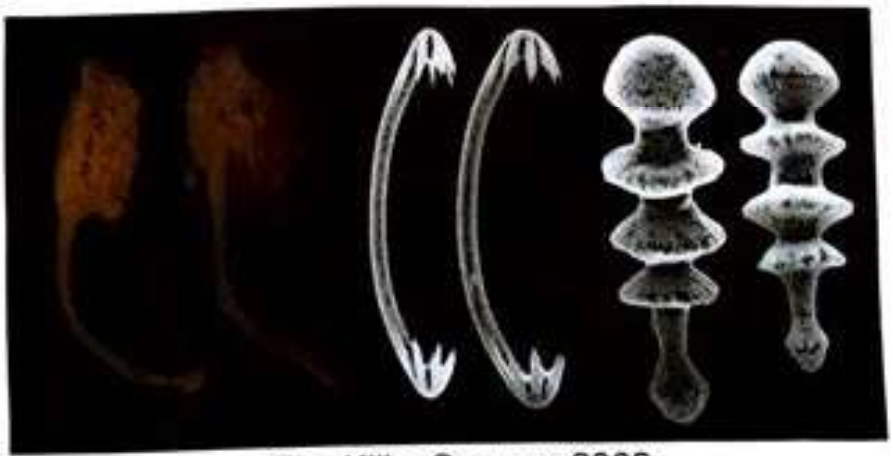

The Killer Sponge, 2009

Matilda Viper, 2010

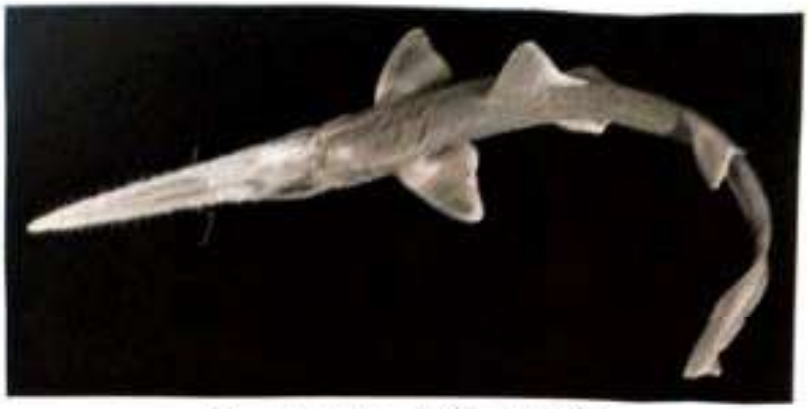

The "Stabbing" Shark, 2011

The "Micro" Chameleon, 2012

Olinguito, 2013

Ankarafa Skeleton Frog, 2014

Crop Circle Fish, 2015

slither under a spiral shell that wraps tightly around a single axis as it grows, this new species discovered in Malaysia, boasts four separate axes—making it the most convoluted snail known. This member of the Diplommatinidae family is endemic to Malaysia. The snail shell is 1.5 millimetres (0.059 in) high and 0.9 millimetres (0.035 in) wide and were found on a limestone karst formation where conditions are damp, but the snails that inhabit them have yet to be observed.

☆ **Discovered in 2009 :** The killer sponge (*Chondrocladia turbiformis*) -

Most sea sponges are similar to their namesakes — happy to survive on bits of plant matter and bacteria that filter their way. In the dark depths of the sea, however, some sponges eat meat. A newly discovered carnivorous sponge, *Chondrocladia* (*Meliiderma*) *turbiformis*, is noteworthy in this regard. This sponge from a seamount off New Zealand has a unique spicule that spurred its discoverers to coin the new term "trochirhabid." Similar structures are known only from Early Jurassic fossils, roughly 175 million to 200 million years ago. Body irregular in shape, covered with long, irregular thick expansions at the surface, up to 8 mm long. Stalk curved in most specimens, smooth, with some irregular swellings. Color clear brown, more translucent in the stalk. Numerous whitish oval bodies, probably embryos found in the body of most specimens.

☆ **Discovered in 2010 :** The "Matilda" Viper (*Athens matildae*) -

Matilda's Horned Viper (*Athens matildae*) is one the few new snakes discovered in Africa (Tanzania in this case) in the last 30 years. It was discovered in the Southern Highlands of Tanzania during a 2010—2011 biological survey. The yellow-green-black slithering bastard with two horns protruding ' from its head can grow up to 65 centimeters or bigger, and is believed to be venomous. Scientists do claim that the snake is very calm and not at all aggressive. It's been named after a 7-year-old girl named Matilda, the daughter of one of the researchers who discovered the snake.

☆ **Discovered in 2011 :** The "Stabbing" Shark (*Pristiophorus nancyae*) —

A combination of both shark and saw and yet sawsharks are a thing that actually exists. In 2011, the African Dwarf Sawshark (*Pristiophorus nancyae*) was accidentally captured in a 1600-foot-deep trawling net off the coast of Mozambique, bringing the total number of sawshark species worldwide to seven. The African dwarf sawshark has a long "saw" like snout, or rostrum. The rostrum is edged with pointy teeth that are used for both hunting and defence.This species is noted for its general elongated and slender form and a rostrum roughly 1/3 of its total length. It usually hunts by blindly charging into schools of fish, stabbing a few at random with its sword nose, and then returning to feast on the casualties.

☆ **Discovered in 2012 :** The "Micro" Chameleon (*Brookesia micra*) -

The Little Reptile That Could stand up there in the picture is a species of chameleon named *Brookesia micra*, and it was discovered on the island of Madagascar in 2012. It is currently the smallest known chameleon in the world - measuring at just 0.63 inches without the tail, small enough to stand comfortably atop of "a match head. Its small size is probably due to insular dwarfism, i.e. what happens when an animal reproduces in an environment with limited food or a large number of predators.

☆ **Discovered in 2013 :** Olinguito (*Bassaricyon neblina*) —

The olinguito (oh-lin-ghee-toe), scientific name -*Bassaricyon neblina*, looks like a cross between a house cat and a teddy bear. It is actually the latest scientifically documented member of the family Procyonidae, which it shares with raccoons, coatis, kinkajous and olingos. The 35cm-long and 2-pound olinguito, with its large *eyes* and woolly orange-brown fur, is native to the cloud forests of Colombia and Ecuador, as its scientific name, "neblina" (Spanish for "fog"), hints. In addition to being the latest described member of its family, another distinction the olinguito holds is that it is the

newest species in the order Carnivora—an incredibly rare discovery in the 21st century.

☆ **Discovered in 2014 :** Ankarafa Skeleton frog (*Boophis ankarafensis*)-

The skeleton frog was described in the summer of 2014. The frogs are called 'skeleton' because of their semi-transparent skins. Sometimes all it takes is fewer clicks. Scientists have discovered a new species of frog from Madagascar that stuck out in part because it "clicked" less during calls than similar species. Adult males measure 23-24 mm (0.91-0.94 in) and female (one specimen) 29 mm (1.1 in) in snout-vent length. The body is slender, with the head much wider than the body. Unfortunately the scientists believe the new species— dubbed the Ankarafa skeleton frog (*Boophis ankarafensis*)—is regulated to a single patch of forest, which, despite protected status, remains hugely threatened. All individuals were detected from the banks of two streams in Ankarafa Forest.

☆ **Discovered in 2015 :** Crop Circle Fish (*Torquigener albomaculosus*) -

The discovery of *Torquigener albomaculosus* helped scientists solve a mystery 20 years in the making. Intricate, circular geometric designs as large as 6 feet in diameter were dubbed 'crop circles of the sea' by the scientific community when they were discovered off the coast of Japan. As it turns out, male T. *albomaculosus* are responsible for the designs. They are spawning nests, formed by the males to attract females. The ridges and grooves in the design prevent ocean currents from disturbing the fertilized eggs.

End note :

The discovery of new species each year cannot suppress the bleak picture of current biodiversity threat. Yet it gives some degree of assurance that life will always find a way to thrive against all odds.

More Read :

1. Mora C, Tittensor, D.P., Adi, S., Simpson, A.G.B., and Worm, B. (2011) How many species are there on Earth and in the ocean? PLoS Biology, 9(8): e 1001127
2. Conservation International - Expeditions and Discovery (December, 2012)
3. Smithsonian - Meet the New Species (December, 2012)
4. Thompson, C. (2011) Treasure Island: New biodiversity on Madagascar (1999 - 2010). WWF Madagascar and West Indian Ocean Programme Office, Madagascar.
5. Conservation International - The Search for Lost Frogs (December, 2012)
6. Fontaine, B., Perrard, A. and Bouchej, P. (2012) 21 years of shelf life between discovery and description of new species. Current Biology, 22(22): 943-944.
7. Zoological Society of London (ZSL) - New Discoveries (December, 2012)

Cryptography—An Application of Number Theory

Tanusree Dutta
(Department of Mathematics)

In this paper we give a brief idea of cryptography without going the details of the inherent mathematics and showed how the number theory especially the prime numbers plays a vital role in the security system of cryptography. Also in course of our discussion our intention is to highlight some unsolved problems of number theory.

▲ Introduction :

Cryptography originated from the Greek word cryptos which means " secret hidden". The subject cryptography mainly deals with the art of disguising a message so that only its legitimate recipient can understand it. The subject was developed in the latter part of nineteenth century. The entire process consist of two parts: initially the message is disguised, this is called the encryption and the encrypted message is known as cryptogram and after transmitted in the channel the legitimate recipient received the coded message and he must have a tool to decode the cryptogram to the original message. This is called decryption. The entire subject stops on one question that how the coded message is secure or alternatively what is the art of breaking a cipher and the people used to do such jobs are called crypto-analysts. Of course to "break" a cipher is to find a way to decrypt it when one does not hold the decoding tools: that is what eavesdroppers have to do. Cryptoananlysis has other uses besides breaking ciphers and one of the applications is to decipherment of ancient encryptions.

▲ Number Theory:

Let us now discuss few facts about number theory specially, prime numbers which is the sole constituent of the entire security system of the cryptography. The numbers or natural numbers like 1,2,3,.... are the abstract mathematical objects and are most fundamental not only to our everyday life but also to practically all mathematics - so much that one of the most famous mathematician of nineteenth century Leopold Kronecker made an comment " God created the natural numbers and all the rest is the work of man."

Various properties applied to natural numbers splitting them into two classes. One property is that of being even which splits it into the class of those that are even (2, 4, 6, 8, ...) and that are not (1, 3, 5, 7, ...). Other property is the divisibility of a natural number by any number say 3. Then 3, 6, 9, 12 that are divisible by 3 while 1, 2, 4, 5,7 are not. The even - odd division is quiet natural but divisible by 3 is not so natural and not of great interest. One more division is based on whether a number is perfect square or not, like 1,4,9,16,25 are perfect squares. But the most important way of dividing up the natural number into those that are prime and those that are not.

A number is said to be a prime number if the only number that divide it are 1 and the number itself.

Thus 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 are prime numbers while 1, 4, 6, 8, 9, 10 etc are not prime. The number that are not prime are said to be composite. The first natural number 1 is a special

number which is by convention neither prime nor composite. The Greek mathematician Euclid proved in his famous book "Elements" that every natural number greater than 1 is either a prime or else can be expressed as a product of primes in a way that is unique except for the order in which the primes are arranged. Thus 75, 900 is a composite number and its prime factors are

$$75,900 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 11 \times 23$$

This theorem tells us that prime numbers are the basic building block from which all natural numbers are constructed. This prime factorization of a number is of fundamental importance in cryptography which we will discuss later. But for now what about the prime number themselves?

The most basic question one may ask is how common the prime numbers are? Is there a biggest prime or the primes go forever, getting larger and larger. Now if we try to locate the prime numbers in a range of ten numbers starting from 2 then between 2 and 11 there are five namely 2, 3, 5, 7,11 exactly half of the collection, then in the next ten between 12 to 21 there are three (13,17,19) i.e., in.a proportion of 0.3, in the next ten again the proportion is 0.3 but for the next two groups of ten the proportion falls to 0.2. So the primes seems to "thin out" further if one go along the sequence of natural numbers. But do they peter out altogether. The answer is no. This was also demonstrated by Euclid.

Interestingly the biggest prime so far invented in the world was in September 2008 and the number is a giant that requires more than 13 million digits to write out in standard decimal format and printing out the entire number in a book would require about 800 pages or in a line about 30 miles long. In exponent notation the number has a more manageable from:

$$9^{43,112,609} - 1$$

Do you have any idea about the value of this number or the power of an exponent. Consider an ordinary 8×8 chess board and placing piles of counters 2 mm thick on the square according to the following rule. Number the square from 1 to 64. on the first square place 2 counters, on the second square place 4 counters; on the third square place 8 counters and so on i.e., on each square placing exactly twice as many counters as on the previous one. So on the n^{th} square we have a pile of 2^n counters. In particular on the last square of the chess board we have a pile of 2^{64} counters. How high you think the pile will be? One meter or one kilometer? Surely not! Well, believe it or not, the pile of counters will stretch out beyond the moon (mere 400,000 kms away) and even if beyond *the* sun (150 million kms away) and-will in fact reach almost to the nearer star, Proxima Centurai some 4 light years away from the earth, in decimal format

$$2^{64} = 18,446,744,073,709,551,616$$

So much for 2^{64} then what about $2^{43,112,609}$ that appears in the record prime expression. How you handle, number of this size.

Numbers that can be obtained by raising 2 to a power and then subtracting 1 are called Mersenne numbers and prime numbers of these particular forms are called Mersenne primes. Record prime numbers are in general Mersenne prime as because of the rapid growth of the function 2^n and there is a efficient and fairly simple way to check whether a Mersenne number is prime or not.

Still to check the primality of a large number of Mersenne type we have to use super computers which are capable of performing several billion arithmetic calculation in a second. Amazingly, most of the record primes discovered in recent years have been found using super computer searches that have run for several months. There is a team of mathematicians called GIMPS (Great Internet Mersenne Search) who are in continuous search for larger primes. Most of the researches are carried out at Cary Research and Manufacturing Center in Chippewa Falls, Wisconsin, U.S by using the latest super computer Cray T - 94.

Now one question may arise. Why do people crazy about searching primes or why do manufacturers of highly expensive super computers devote hours of computer time trying to find large prime numbers? What is so special about the prime numbers? The answer will be clear in our subsequent discussion.

We have already mentioned that Euclid has made some discussion on the basic properties of number theory in his famous book "Elements" but this crops up several questions on the mind of mathematicians from time to time which simply enhance the beauty of the subject and the ever legendary mathematicians as well as child prodigy Karl Friedrich Gauss termed the number theory as the "queen of mathematics". Apart from Gauss significant contribution to physics and astronomy, at the age of 24 he published a book "Disquisitions Arithmeticae" in 1801 where he made some fundamental remarks on Euclid's work and his works forms the basis of present day number theory.

We now list up few of the^ problems of number theory and after reading you try to guess which one the most difficult to solve. You will probably surprise when we discuss the faith of this problem afterwards.

(i) If p is a prime no, does p always divide $2^{p-1} - 1$?

(ii) Is there a prime p such that p^3 divides $2^{p-1} - 1$?

(iii) Is each even integer greater then 2 a sum of two primes?

(iv) Are there two consecutive integers apart from 8 and 9 which are powers of integers?

(v) Can every odd prime number be written as a sum of two squares of integers?

(vi) Are there infinitely many pairs of prime number of the form p, p+2? (vii) Are there infinitely many prime numbers p for which $2^p - 1$ is also a prime?

Question (i) and (ii) are very similar and even if one may think that (ii) is easy to solve as it requires only a single prime which satisfies this properties but to prove (i) it should be proved for all prime numbers. Interestingly (i) is true and it way proved by Fermat in seventeenth century while (ii) is still an open problem.

The third problem is very famous and is known as Goldbach conjecture and though it has been around for more then 200 years but no one has yet manage to prove it.

Question (iv) is known as Catalan's conjecture and is also an open problem.

The answer to question (v) is no. Fermat shows that if an odd prime p leaves remainder 3 when it is divided by 4 then it is not possible but if the remainder is 1 then the question has an affirmative answer.

Problem (vi) is famous twin-prime conjecture and it is not known whether the statement is true or false.

Finally the last question is also an open problem. We have already mentioned that numbers of the from $2^n - 1$ are called Merssene number after the name of French monk Marin Merssene. In 1644 in the preface of his book "Cogitata Physica Mathematicae" Merssene claimed that number of the from $2^n - 1$ are prime for n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67,127 and 257 and composite for all other n less than 257. He never mentioned how he got this result and after long time only in 1947 when desktop calculators became available it was finally possible to check his claim. It was found that he had made only five mistakes M_{67} and M_{257} are not prime while M_{61}, M_{89}, M_{107} are prime. In fact to date there are only 46 known Merssene primes of which 12 was already known from the time of Merssene.

Think about the situation where we are in the field of number theory after the first proposition made by Euclid around 330 B.C.

To test the primality of a number one must understand that the entire problem lies in factorizing a number i.e., for a given number of any digit either we have to find prime factors or we have to ascertain that no such factorization is possible. Till date no such efficient algorithm is there to factorize a number of any given digit.

In this connection there is a nice story rather a real fact that took place in an meeting at American Mathematical Society the most prestigious organization of world wide mathematicians in 1903. The mathematician Fedrick Nelson Cole was listed in the program for presenting a paper with rather unassuming title "On the Factorization of Large Numbers". When called on to speak Cole walked up to the black board and without saying a word, performed the • calculation of 2 raised to the power 67, after which he subtracted 1 from the result. Still saying ? nothing he moved to a clean

part of the board and multiplied together two numbers 193,707, 721 and 761, 838, 257, 287. The answer to the evaluations were the same, Cole returned to his seat still having uttered not one word and for the first time and only time on record, the entire audition at an AMS meeting rose and gave the "speaker" a standing ovation.

You feel how the situation is and what a great job Cole has done and above all he disprove the claim of Merssene that M_Q, is prime.

- The security of the large international data networks nowadays relies on the inability of mathematicians to find an efficient method of factoring large numbers.

▲ Cryptography :

The concept of sending secret codes is not a new idea. Julius Caesar used them to ensure the security of the orders he sent to his generals during Gallic wars. Nowadays it is not only the military who require their communications to be made secure by encryption techniques; there also commercial and business houses who use this technique for transferring secret information for their different purposes.

Certainly, the simple kind of cipher that Caesar used would be woefully inadequate today. In a " Caesar cipher" the original message is transformed by replacing each letter of each word with some other letters according to some fixed rule such as taking the letter three places further along in the alphabet so tjaat A would be replaced by D, G with J, Y with B and so on.

On this system the w6rd mathematics becomes *pdwkhpdwlfv.*

Without knowing the rule used, a message encrypted in this way may look on the surface to be totally indecipherable, but this is by no means the case. Since there are only 25 "shift along" cipher and an eavesdropper who suspect that you are using one, would only need to try them all until he found the one you used. But even if you use some other less obvious rule of substituting letters, the resulting code will not be secure. The problem is that there are one definite frequencies with which an individual letter or some specific word occur in English and by counting the number of occurrence of that letter or word in your coded text, an enemy can just deduce just what your substitution rule is - especially when the computers are used to speed up the process.

What else one can do. Any kind of recognizable pattern in your coded text, a sophisticated statistical analysis can usually crack the code without much difficulty. All modern cipher systems use computers; they must. The enemy may be assumed to have much powerful computers to analyze the message, so the system needs to be sufficiently complex to resist a computer attack. Lets not forget that some of the first computers were build to break the German codes used during Second World War.

Nowadays, the communication between computers using internet is posing new challenges to cryptographers. Since the messages are sent through telephone lines, it is necessary to en-xrypt them if they contain some sensitive information. That need not be a government secret; it could be just your credit card number! Imagine that a company does its bank transaction through computers. Two problems immediately come into force. First it is necessary to make sure, it will not be possible to read the message if it is intercepted by eavesdropper. Second, the bank must have some way of knowing that the message has originated by a legitimate user of the company. In other words, it must be possible to sign an electronic message.

▲ DES - cryptosystem:

Because of this problem, a new cipher system was constructed with two components: an encryption procedure and a key. The former is typically designed program or a special computer. To encrypt a message, the system requires not onlyjhe message but also the chosen key usually a secretly chosen number. The encryption program codes the message in a way that depends on the chosen key so that only by knowing that key it is possible to decode the ciphered text. As the security depends' on the key the same encryption program may be used by many people for a long period of time. So what happens is that an enemy may know what encryption system you are using without being

able to crack your coded message - a task for which knowledge of your key is required.

One such system is the American designed Data Encryption Standard (DES) which requires, for its key a number binary representation has 56 bits. Why such a long key? All the details of the DES system was published. So theoretically an enemy could crack your message simply by trying all possible keys until finding the one that works. As there are 2^{56} possible keys to be tried, a number that is so large as to render the task virtually impossible. But this system has some drawback that before using DES system, the sender and the receiver must agree on a key they will use and since they will not want to transmit the key over any communication channel they have to meet first or employ some trusted courier to convey the key. This is. not suitable for use in international banking or commerce in which it is often necessary to send secure message across the world to some one the sender has never met.

▲ Public key cryptosystem:

In 1975, Whitfield Diffine and Martin Hellman of Stanford introduced a new type of cipher system: public key cryptography, in which the encryption method requires two keys - one for enciphering and other for deciphering. Such a system is used as follows: A new member purchased the standard program (or special computer) used by all members of the communication network concerned. He then generates two keys. One of these, his deciphering key, he keeps secret. The other key, the one used for encoding message sent to him by anyone else in the network, he publishes in a directory of network users. To send a message to a network user, all that one does is to look up the user's public encryption keys, encrypt the message using key and send it. To decode the message it is not helpful to know the enciphering key. Instead, you need the deciphering key and only the intended receiver knows that so even the message sender cannot decode the message once it has been encrypted. Thus the public key cryptosystem have a "trapdoor" i.e., an operation that is easy to perform but difficult to undo.

▲ RSA - cryptosystem:

The best known and the most widely used public key cryptosystem is the RSA - cryptosystem. It was introduced in 1978. by R. L. Rivest, A. Shamir and L. Adelman at MIT. A detailed description of the RSA requires a good amount of mathematical knowledge. However, it is convenient to have some understanding of the reason why knowledge of encryption procedure "of the RSA does not give an immediate access to the decryption process. Suppose we want to implement RSA - cryptosystem for a given user. The basic ingredients are two distinct primes that we call p and q. Let n be the product of this primes thus $n = pq$. The public key is n (and another number that we need not worry about now). The secret key is the pair of primes that every user has a personal belonging. Thus if a bank uses RSA, every one can send it an encrypted message because it is known to all.

Then why it is difficult to break RSA. After all, one need only factor n to find p and q. However, if the primes have more than 100 digits each, the time and resources required to factor n are such that the system becomes very hard to break. Thus the trapdoor of RSA lies in the fact that it is easy to multiply p and q to get n but while factoring n to get p and q can be next to impossible. But you observe that the obstacle is essentially of a technological kind. In other words it is conceivable that advance in hardware and the better method for factorization could one day render the RSA obsolete.

The point was dramatically illustrated when RSA - 129 was broken. This was a test message encrypted by the inventors of RSA in 1977 and it got its name from the fact that the encryption key has 129 digits. The MIT groups offered $100 to the first person who can manage to crack the code. At that time with the available method of factorization they thought that it will take more than 20,000 years to factor the 129 digit number and the MIT group thought their money was safe. Just after 19 years, in 1996, after the Pomerance's quadratic sieve method for factoring large numbers, the 129 digits number can finally be factorized after eight months of

work by 600 volunteers in 25 countries. Even if RSA - 130 was also factorized. Now we sum up the entire process of RSA - cryptosystem.

(i) To implement RSA we need two large prime p and q.

(ii) To encrypt a message using RSA we use n = pq.

(iii) To decrypt an RSA we must know p and q.

(iv) The security of RSA depends on the fact that it is difficult to factor n and find p and q, because these are very large.

One question may arise, -fe the above steps (i) and (iv) apparently seems to contradict each other. On one hand the security of RSA depends on inability to factorize such a large number n, on the other hand we need to prove p and q are prime i.e., they don't have factors except 1 and the number itself, again the question of factorization comes.

But this is not the case as we do not prove primality of a number by trying to factorize' it. For example it is known that is a composite number but none of its factors are known. There are some methods like Lucas Lehmer test, Miller's test where we test the primality or compositeness of a number without factorizing it. In practice the public key used in RSA is a very large number may be more than 200 digits.

Thus we observe how number theory plays a crucial role in RSA - cryptography.

▲ **Signature:**

Finally I would conclude my talk after giving a brief discussion on digital signature as have already stated above. If a company does its bank transactions by computer, it is clear that both the company and the bank will require that the information be encrypted before it is transferred between the computers. But it is not sufficient enough. As.the bank encryption key is public so anyone can send message to the bank in encrypted form saying that for instance, to transfer all the company's fund to a persons own account. How can the bank be sure that the message it has received is genuine. In other words how can an electronic message be signed.

The method is simple and it can work for any public key cryptosystem.

Let E_e and D_e be the company's encryption and decryption functions, and let E_b and D_b be the corresponding functions of the bank. Let a be a block of message the company wishes to send the bank. To avoid the eavesdroppers to read the message the company must send the bank the encrypted block $E_b(a)$. To make sure that the message is also signed, the company will send the bank the block $E_b(D_e(a))$. In other words the message is first encrypted using company's private key and the result is again encrypted with the bank's public key.

Having received the block $E_b(D_e(a))$ the bank will apply its first decryption key to get the message $D_e(a)$ and to this block it will then apply company's encryption function to get a as company's encryption function is public and known to all.

Why this process is sufficient enough to ensure that the message could not be originated outside the company. The bank must apply the sequence of functions E_eD_b on the coded message and if after decodinr the message makes any sense then the block: of the original message must be encrypted with the function E_bD_e. However D_e is the company's secret decryption function and its access is restricted to those employees of the company who have the right of transaction on behalf of company. Thus the message must originated from the company.

References

[1] Mathematics the new golden age: Keith Devlin.

[2] The mathematic. of ciphers : S. C. Coutinho.

Cover Design by Dr. Shrikumar Mishra

Printed by
Books Space
2B/3, Nabin Kundu Lane, Kolkata-9
e-mail : booksspace2011@gmail.com